DIVIDE AND RULE

শোষণের হাতিয়ার

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

এমাম, হেযবুত তওহীদ

DIVIDE AND RULE

শোষণের হাতিয়ার

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

মাননীয় এমাম, হেযবুত তওহীদ

DIVIDE AND RULE

শোষণের হাতিয়ার

সম্পাদনা : মো: রিয়াদুল হাসান

(বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে)

প্রচ্ছদ: মো: মনিরুল এসলাম

প্রকাশনা ও পরিবেশনা: তওহীদ প্রকাশন

তওহীদ প্রকাশন

(বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের একমাত্র পরিবেশক)

৩১/৩২ পি.কে.রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ফোন: ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৬৭০১৭৪৬৫১

ATAGLANCE.HEZBUTTAWHEED.COM

ISBN: 978-984-8912-24-9

প্রকাশকাল : ২০ ডিসেম্বর ২০১৩ ঈসায়ী

মূল্য : ১২০.০০ টাকা মাত্র

এমামুয্যামান The Leader of The Time

জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

মাননীয় এমামুয্যামান টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারে ১৫ই শাবান ১৩৪৩ হিজরী, মোতাবেক ১৯২৫ সনে ১১ মার্চ শেষ রাতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব কাটে নিজ গ্রাম করটিয়া। কোলকাতার ইসলামিয়া কলেজে শিক্ষা লাভের সময় তিনি ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়েন। এবং এই সংগ্রামের কিংবদন্তীতুল্য নেতৃবৃন্দের সাহচর্য্য লাভ করেন। যাদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম, মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, অরবিন্দ বোস, শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দী অন্যতম। অল্প বয়স থেকে সময় পেলেই তিনি বেরিয়ে পড়তেন শিকারে, রায়ফেল হাতে হিংস্র পশুর খোঁজে ছুটে বেড়াতেন দেশের বিভিন্ন এলাকার বনে জঙ্গলে। ১৯৬৩ সনে তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ছোট বেলায় তিনি যখন মোসলেম জাতির পূর্ব ইতিহাসগুলি পাঠ করেন তখনই তাঁর মনে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। তিনি মোসলেম জাতির অতীতের সাথে বর্তমান অবস্থার এই বিরাট পার্থক্য দেখে তিনি ভাবতে থাকেন যে কিসের পরশে এই জাতি চৌদ্দশ বছর পূর্বে শিক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সামরিক শক্তিতে, ধনবলে পৃথিবীর

সবচেয়ে শক্তিমান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি অঙ্গনে অগ্রণী জাতিতে পরিণত হোয়েছিল, আর কিসের অভাবে আজকে তারা দুনিয়ার সবচেয়ে হতদরিদ্র ও অশিক্ষা-কুশিক্ষায় জর্জরিত, সব জাতির দ্বারা লাঞ্ছিত এবং অপমানিত? মহান আল্লাহ ধীরে ধীরে তাঁকে এই প্রশ্নের জবাব দান কোরলেন। ষাটের দশকে এসে তাঁর কাছে বিষয়টি দিনের আলোর মত পরিষ্কার হোয়ে ধরা দিল। মানবজাতির সামনে এই মহাসত্য তুলে ধরার জন্য বই লিখেন এবং ১৯৯৫ সনে হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের সূচনা করেন। ১৬ জানুয়ারী ২০১২ ঈসায়ী এই মহামানব প্রত্যক্ষ দুনিয়া থেকে পর্দাগ্রহণ করেন।

বিশেষ অর্জন (Achievements)

১. ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন: তিনি তেহরিক এ খাকসারের পূর্ববাংলা কমান্ডার ছিলেন এবং বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য 'সালার এ খাস হিন্দ' পদবিযুক্ত বিশেষ কমান্ডার নির্বাচিত হন।

২. চিকিৎসা: বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান, তৎকালীন ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল এসলামসহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তি তাঁর রোগীদের অন্তর্ভুক্ত।

৩. সাহিত্যকর্ম: বেশ কিছু আলোড়ন সৃষ্টিকারী বইয়ের রচয়িতা যার একটি ২০০৮ এর সর্বাধিক বিক্রয়কৃত বই। তাঁর বাঘ-বন-বন্দুক বইটি পাকিস্তান লেখক সংঘের (পূর্বাঞ্চল শাখা) সম্পাদক শহীদ মুনির চৌধুরীর সুপারিশে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে দ্রুতপাঠ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়াও তিনি পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসা, ধর্ম ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখেছেন।

৪. শিকার: বহু হিংস্র প্রাণী শিকার কোরেছেন যার মধ্যে চিতাবাঘ, বন্য শুকর, অজগর সাপ, কুমির প্রভৃতি রোয়েছে।

৫. রায়ফেল শুটিং: ১৯৫৪ সনে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান দলের অন্যতম রায়ফেল শুটার হিসাবে নির্বাচিত হন।

৬. রাজনীতি: পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি.) নির্বাচিত হন (১৯৬৩-৬৫) । প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য থাকা অবস্থায় তিনি 'কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এ্যাসোসিয়েশন' এর সদস্যপদ লাভ করেন।

৭. সমাজসেবা: হায়দার আলী রেডক্রস ম্যাটার্নিটি এ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল ও সাদাত ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা।

৮. শিল্প সংস্কৃতি: নজরুল একাডেমির আজীবন সদস্য।

সূচিপত্র

১। দাজ্জাল? ইহুদি-খ্রিস্টান ‘সভ্যতা’!

২। দাজ্জালের বিভক্তিকরণ নীতি: শোষণের হাতিয়ার

- স্বাধীনতা নামক মরিচিকা
- রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য
- ধর্মীয় ভাগ
- মতবাদ নিয়ে মতান্তর
- মুদ্রার মানের তারতম্য
- ধর্মীয় দল উপদল
- রাজনৈতিক বিভক্তি
- কারাগারেও বিভক্তি
- চাকুরীক্ষেত্রে বিভক্তি
- সামরিক বেসামরিক বিভক্তি
- ধনী নির্ধনের পৃথক হাসপাতাল
- সরকার পোষণে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়
- শ্রমিক ও মালিক বিরোধ
- পদবি বিতরণ করে বিভাজনের সৃষ্টি
- প্রশাসনিক বিভক্তি
- রাষ্ট্রসংঘ শোষণের আধুনিক পদ্ধতি
- মানবজাতির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উপায় আছে কি?
- জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রক্রিয়া সালাহ ও হজ্ব

৩। মানবজাতি এক জাতি হবে

৪। ভারতীয় অবতার এবং নবী-রসুলগণ

- ভারতীয় অবতার শ্রীকৃষ্ণ কে ছিলেন?
- এসলামী চিন্তাবিদ ও মোসলেম মনীষীদের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ
- শ্রীকৃষ্ণের জীবনাচার ও বৈশিষ্ট্য কি বলে?

৫। ধর্মীয় সহিংসতা থেকে মানবজাতির মুক্তির পথ

৬। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রাজনৈতিক হাতিয়ার

৭। টাকা দিয়ে সুখ কেনা গেল না

৮। জান্নাতি ফেরকা কারা?

৯। আমার কথা

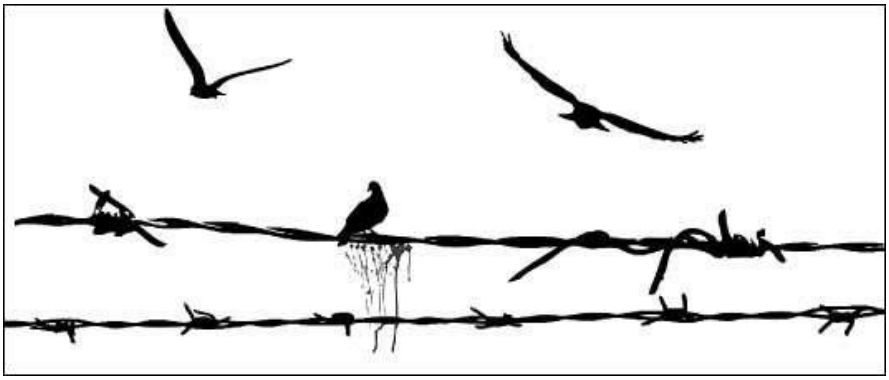

Where the mind is without fear and the head is held high;

Where knowledge is free;

Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls;

Into that heaven of freedom, my Lord, let the mankind awake.

~Rabindranath Tagore

আমাদের অন্যান্য প্রকাশনা

১. এসলামের প্রকৃত রূপরেখা

২. এসলামের প্রকৃত সালাহ্

৩. যামানার এমামের পক্ষ থেকে মহাসত্যের আহ্বান

৪. দাজ্জাল? ইহুদি-খ্রিস্টান 'সভ্যতা'!

৫. Dajjal? The Judeo-Christian 'Civilization'! (অনুবাদ)

৬. হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৭. জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস

৮. এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব (পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সঙ্কলন)

৯. আসুন-সিস্টেমটাকেই পাল্টাই

১০. আল্লাহর মো'জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা

১১. বাঘ-বন-বন্দুক (শিকারের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ)

১২. বিশ্বনবী মোহাম্মদ (দ:) এর ভাষণ

১৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি যামানার এমামের পত্রাবলী

১৪. দাজ্জাল? ইহুদি-খ্রিস্টান 'সভ্যতা'! (ডকুমেন্টারী ফিল্ম)

১৫. দাজ্জাল প্রতিরোধকারীদের সম্মান ও পুরস্কার (ডকুমেন্টারী ফিল্ম)

১৬. আল্লাহর মো'জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা- মো'জেজার ভাষণের সিডি

১৭. অন্যান্য দল না কোরে হেযবুত তওহীদ কেন কোরব? (আলোচনার ভিসিডি)

১৮. The Leader of the Time (গানের অ্যালবাম-সিডি)

১৯. এ জাতি আবার জাগবে (প্রকাশিতব্য)

২০. এসলাম শুধু নাম থাকবে

২১. বর্তমানের বিকৃত সুফিবাদ

২২. সন্মার্গ

বেসমেল্লাহের রহমানের রহিম

দাজ্জাল? ইহুদি-খ্রিস্টান ‘সভ্যতা’!

বিশ্বনবী মোহাম্মদ (দ:) বোলেছেন, আখেরী যামানায় বিরাট বাহনে চোড়ে এক চক্ষুবিশিষ্ট মহাশক্তিধর এক দানব পৃথিবীতে আবির্ভূত হবে; তার নাম দাজ্জাল। সে আল্লাহর বদলে নিজেকে মানবজাতির প্রভু (রব) বোলে দাবী কোরবে (বোখারী)। দাজ্জালের সঙ্গে জান্নাত ও জাহান্নামের মত দুইটি জিনিস থাকবে। সে যেটাকে জান্নাত বোলবে সেটা আসলে হবে জাহান্নাম, আর যেটাকে জাহান্নাম বোলবে সেটা আসলে হবে জান্নাত। যারা তাকে প্রভু বোলে মেনে নেবে তাদেরকে সে তার জান্নাতে স্থান দেবে। (বোখারী, মোসলেম)। তার কাছে রেযেকের বিশাল ভাণ্ডার থাকবে। যারা তাকে রব বোলে মেনে নেবে তাদেরকে সে সেখান থেকে দান কোরবে। আর যারা তাকে রব বোলে অস্বীকার কোরবে, অর্থাৎ তার আদেশমত চোলবে না, তাদের সে তার ভাণ্ডার থেকে দান তো কোরবেই না বরং তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা (Sanction) ও অবরোধ (Embargo) আরোপ কোরবে। তার পদতলে সমগ্র মোসলেম বিশ্বের করুণ পরিণতি নেমে আসবে (বোখারী, মোসলেম)। মহানবী এই দাজ্জালের আবির্ভাবকে আদম (আঃ) থেকে কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য সবচেয়ে গুরুতর ও সাংঘাতিক ঘটনা বোলে চিহ্নিত কোরেছেন (মোসলেম), শুধু তা-ই নয়, এর মহাবিপদ থেকে তিনি নিজে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন (বোখারী)।

আল্লাহর অশেষ করুণায় হেযবুত তওহীদের এমাম, এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী সেই দাজ্জালকে চিহ্নিত কোরেছেন। তিনি প্রমাণ কোরেছেন যে, **পাশ্চাত্য বস্তুবাদী ইহুদি-খ্রিস্টান যান্ত্রিক সভ্যতাই হোচ্ছে বিশ্বনবী বর্ণিত সেই দাজ্জাল, যে দানব ৪৭৬ বছর আগেই জন্ম নিয়ে তার শৈশব, কৈশোর পার হোয়ে বর্তমানে যৌবনে উপনীত হোয়েছে** এবং দোর্দণ্ড প্রতাপে সারা পৃথিবীকে পদদলিত কোরে চোলেছে; আজ মোসলেমসহ সমস্ত পৃথিবী অর্থাৎ মানবজাতি তাকে প্রভু বোলে মেনে নিয়ে তার পায়ে সাজদায় পোড়ে আছে।

দাজ্জাল শব্দের অর্থ চাকচিক্যময় প্রতারক, যেটা বাইরে থেকে দেখতে খুব সুন্দর কিন্তু ভেতরে কুৎসিত, যেমন মাকাল ফল। পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতা বাইরে থেকে দেখতে চাকচিক্যময়, এর প্রযুক্তিগত সাফল্য মানুষকে মুগ্ধ করে, চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, কিন্তু এর প্রভাবাধীন পৃথিবী অন্যায়,

অত্যাচার, অবিচার, যুদ্ধ, ক্ষুধা, রক্তপাত, ক্রন্দন, অশ্রুতে ভরপুর। বিগত শতাব্দীতে এই 'সভ্যতা' দুইটি বিশ্বযুদ্ধ ঘোটিয়ে চৌদ্দ কোটি আদম সন্তান হতাহত কোরেছে এবং তারপর থেকে বিভিন্ন যুদ্ধে আরও দুই কোটি মানুষ হত্যা কোরেছে। আহত বিকলাঙ্গের সংখ্যা ঐ মোট সংখ্যার

বহুগুণ। আর এ নতুন শতাব্দীতে শুধু এক ইরাকেই হত্যা কোরেছে দশ লক্ষাধিক মানুষ। তাই এর নাম দাজ্জাল, চাকচিক্যময় প্রতারক। ইহুদি-খ্রিস্টান 'সভ্যতা' প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে যে সে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে হটিয়ে দিয়ে সমস্ত পৃথিবীতে নিজের অর্থাৎ মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা কোরবে। এবং মানবজাতি ইতোমধ্যেই তার সার্বভৌমত্বকে মেনে নিয়েছে। মানবরচিত সমস্ত তন্ত্র-মন্ত্র ও বাদ-ই মানুষের জীবনব্যবস্থার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রণালী-এ কথা দাজ্জালের পত্র-পত্রিকায়, রেডিও-টেলিভিশনে, আলোচনা-বক্তৃতায় এবং শিক্ষাব্যবস্থায় অবিশ্রান্তভাবে প্রচারের ফলে প্রায় সমস্ত মানবজাতি এ মিথ্যাকে, এ কুফরকে সত্য বোলে গ্রহণ কোরেছে। মোসলেম বোলে পরিচিত এ জাতিটিও দাজ্জালের তৈরী জীবনব্যবস্থাকে জীবনের সকল সমস্যার সমাধান এবং সুখ-শান্তি-নিরাপত্তার উৎস মনে কোরছে। এভাবেই তারা দাজ্জালকে তাদের প্রভু (রব) বোলে মেনে নিয়েছে। কিন্তু শান্তি কি মিলেছে? মোসলেম নামধারী জাতি দাজ্জালকে না চিনে তার তৈরী জীবনব্যবস্থাকে গ্রহণ কোরে, দাজ্জালের তৈরী জাহান্নামে পতিত হোয়ে সীমাহীন অশান্তিতে জীবন কাটাচ্ছে।

দাজ্জাল সম্পর্কে আল্লাহর রসুলের হাদীসগুলি থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে দাজ্জাল কোনো দৃশ্যমান বা শরীরী (Physical) দানব নয়, তখনকার দিনের মানুষদেরকে বর্তমান সভ্যতার শক্তি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য একটি রূপক বর্ণনা। এ কথায় যারা দ্বিমত কোরবেন তাদেরকে বোলছি- ধরুন আপনার কথামত বিরাট বাহনে আসীন হোয়ে এক চক্ষুবিশিষ্ট এক বিশাল দানব পৃথিবীতে উপস্থিত হোল, তাহোলে কি মোসলেম অমোসলেম কারো মনে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকবে যে এটাই রসুল বর্ণিত দাজ্জাল? চোখের সামনে প্রায় পৃথিবীর সমান আয়তনের দানবকে দেখে কেবল মোসলেমরাই নয়, অ-মোসলেমরাও এক মুহূর্তে চিনে ফেলবে যে, এই তো এসলামের নবীর বর্ণিত দানব দাজ্জাল! অথচ রসুল বোলছেন, কেবল মো'মেনরা নিরক্ষর হোলেও অর্থাৎ লেখাপড়া না জানা হোলেও তার কপালে কাফের লেখা পড়তে পারবে, যারা মো'মেন নয় তারা শিক্ষিত ও পণ্ডিত হোলেও পড়তে পারবে না (বোখারী ও মোসলেম) ।

আল্লাহর রসুল আরও বোলেছেন, দাজ্জাল ইহুদিদের থেকে উদ্ভূত হবে এবং আমার উম্মতের সত্তর হাজার অর্থাৎ অসংখ্য লোক তাকে অনুসরণ কোরবে। দাজ্জাল যদি সত্যিই জ্যান্ত কোনো দানবীয় প্রাণী হয় তাহোলে কী কোরে এমন একটি দানব মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত ইহুদিদের মধ্য থেকে আসতে পারে? আর তাকে দেখেও কেউ তাকে অনুসরণ কোরবে, কেউ কোরবে না, কেউ তার কপালের কাফের লেখা পড়তে পারবে, কেউ পারবে না এ কি হোতে পারে?

আরও মনে কোরুন, প্রচলিত ধারণা মোতাবেক সত্যি সত্যি কোনো বিশাল দানবীয় প্রাণী পৃথিবীতে আবির্ভূত হোল। সেই দানবটা সমগ্র মানবজাতিকে বোলবে তাকে প্রভু বোলে মেনে নিতে। অন্যসব জাতির কথা ছেড়েই দিলাম, বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর, যার আধিপত্য পৃথিবীময়, সেই আমেরিকার যক্তুরাষ্ট্র কি তাকে প্রভু বোলে মেনে নেবে। সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় অবশ্যই নয়। সে (যুক্তরাষ্ট্র) তাকে (দাজ্জাল) আনবিক বোমা মেরে ধ্বংস কোরে ফেলবে। কিন্তু রসুল এমন কোনো সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করেন নি বরং বোলেছেন, দাজ্জাল এমনভাবে সমস্ত পৃথিবী অধিকার কোরবে যে এক টুকরো মাটি বা পানিও তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকবে না। অর্থাৎ এ কথায় কোনো সন্দেহের অবকাশ রোইল না যে দাজ্জাল এমন কোনো বস্তু নয় যা চোখে দেখা যায় (Visible) বা স্পর্শ করা যায় (Tangible)। বর্তমান ইহুদি-খ্রিস্টান সভ্যতাই হোচ্ছে সেই মহাশক্তিধর দানব দাজ্জাল এবং যান্ত্রিক প্রযুক্তি হোচ্ছে তার বাহন।

DIVIDE AND RULE

দাজ্জালের বিভক্তিকরণ নীতি: শোষণের হাতিয়ার

মানবজাতিকে রাজনৈতিকভাবে, রাষ্ট্রগতভাবে, শরিয়াহগতভাবে, এবং এমনকি আত্মিকভাবে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত করার জন্য বর্তমান দাজ্জালীয় সভ্যতার রূপকাররা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আড়ালে যে কয়টি হিংসাত্মক নীতি পৃথিবীতে কায়েম কোরেছে তার অন্যতম হোল Divide and Rule নীতি অর্থাৎ মানবজাতিকে ঐক্যহীন কোরে ফেলা, তারপর শাসন করা। পক্ষান্তরে আকীদাগত ভাবে (Conceptually) শেষনবীর উপর দায়িত্ব হোল সমস্ত মানবজাতিকে একটি জীবনব্যবস্থার অধীনে এনে এক জাতিতে পরিণত করা। তাদের আলাদা আলাদা কোনো সত্তা থাকবে না, সবাই মিলে একটা জাতি হবে। অর্থাৎ সোজা কথা বনী আদম। সাদা, কালো, তামাটে, লম্বা, খাটো, উত্তরের, দক্ষিণের, পূর্বের, পশ্চিমের, পাহাড়ি, বনাঞ্চলের, সমতলভূমির, বরফ অঞ্চলের, মরুঅঞ্চলের সমস্ত মানবজাতি হবে একটা জাতি। তাদের সকলের পিতা একজন আদম (আ:) (Adam)। সেই সূত্রে তারা সকলে ভাই ভাই। এই দীনের নাম আল্লাহ রাখলেন **দীনুল হক**। দীনুল হক বলার কারণ হোচ্ছে এটা আল্লাহ থেকে আগত, আর আল্লাহ হলেন সমস্ত ন্যায়, হক, সত্যের উৎস। পক্ষান্তরে এবলিস থেকে আগত সবকিছুই হোল মিথ্যা, প্রতারণা, অন্যায়, অশান্তি।

এসলামের বিরুদ্ধবাদীরা প্রশ্ন তুলতে পারেন, এটা কিভাবে সম্ভব? ১৪০০ বছর আগে একটি আরবীয় গোত্রে জন্ম নেয়া আরবী ভাষাভাষী নবীর উপরে যে দীন, জীবনব্যবস্থা অবতীর্ণ হোয়েছে সেটা সমস্ত দুনিয়াতে কার্যকরী হবে কিভাবে? এটার সহজ জবাব হলো, এই দীনের আরেক নাম **দীনুল ফেতরাহ** বা প্রাকৃতিক দীন। প্রাকৃতিক নিয়ম নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আল্লাহ এ দীনটি তৈরী কোরেছেন। আল্লাহ যেমন আগুন, পানি, মাটি, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন তৈরী কোরেছেন, যেগুলো পৃথিবীর যেকোন প্রান্তের মানুষের উপযোগী, সকলের জন্য অপরিহার্য। এই সব প্রাকৃতিক নিয়ামক যেমন সমস্ত দুনিয়াতে কার্যকরী, প্রয়োগযোগ্য, গ্রহণযোগ্য তেমনি এ জীবনব্যবস্থাটাও সমস্ত দুনিয়াতে গ্রহণযোগ্য, প্রয়োগযোগ্য, কার্যকরী। এক কথায় সমস্ত দুনিয়াতে শান্তি দিবে এ জীবনব্যবস্থা। পৃথিবীর যেখানে, যে প্রান্তেই এটাকে কায়েম করা হোক, কার্যকরী করা হোক, প্রয়োগ করা হোক না কেন তারা সমানভাবে একই রকম শান্তি পাবে। তাহোলে এসলামের

প্রাথমিক ধারণাই হোল--সমস্ত মানবজাতিকে একটা জাতিতে পরিণত করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা (To sustain peace by uniting mankind). অশান্তির মূল কারণ এই বিভাজন, সুতরাং সকল প্রকারের বিভাজন বিভক্তিকে মিটিয়ে দিয়ে একটা জাতিতে পরিণত করবে আল্লাহর দেওয়া এই জীবনব্যবস্থা।

অপরপক্ষে দাজ্জাল বা বর্তমানের ইহুদি-খ্রিস্টান বস্তুবাদী 'সভ্যতা', আল্লাহর উলুহিয়াতকে, সার্বভৌমত্বকে, রবুবিয়াতকে, মুলকিয়াতকে অস্বীকার কোরেছে, নিজেকে রব, এলাহ, সমস্ত দুনিয়ার অধিকর্তা দাবী কোরছে। দাজ্জালের তৈরী জীবন-ব্যবস্থা, আইনকানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, শিক্ষানীতি, সংস্কৃতি সমস্ত কিছু আজ দুনিয়াময় কার্যকরী কোরেছে, যেগুলি এসলামের বিপরীত। দাজ্জালের নীতি হোল সমস্ত দুনিয়াকে ভাগ করে ঐক্যহীন করে দুর্বল কোরে ফেলা, তারপর একটা একটা কোরে শাসন করা অর্থাৎ Divide and rule. তাদের শাসনেরই অপর নাম শোষণ। তাহোলে এসলামের নীতি হোল Unite and Secure Peace আর দাজ্জালের নীতি হোল Divide and rule. দু'টি সভ্যতার মূলনীতিই একেবারে বিপরীত, তাই চরিত্রও স্বভাবতই বিপরীতমুখী, কাজেই ফলাফলও হবে বিপরীত, এটা সাধারণ জ্ঞান। তাহোলে মানবজাতির আদিম প্রশ্ন: শান্তি কিভাবে আসবে?

এর উত্তর হোল: দীনুল হকেই শান্তি অনিবার্য। আসতেই হবে কারণ এসলাম সব বিভেদ, বিভাজন ভুলে মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে। আর ঐক্যতেই শান্তি এটা প্রাকৃতিক নিয়ম। দশজন ঐক্যবদ্ধ লোক একশত জন্য ঐক্যহীন লোকের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। United we stand, divided we fall. কাজেই প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে শান্তি আসতেই হবে। আর দাজ্জালের ব্যবস্থাতে মানুষের ঐক্যকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করা হোচ্ছে। কাজেই এ বিভাজনের যাবতীয় নীতি ও ব্যবস্থা বজায় রেখে যতই শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হোক, অশান্তি অনিবার্য। এভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার সকল চেষ্টাই প্রকৃতপক্ষে লোক দেখানো চেষ্টা (Window dressing)। মানুষ যেন দাজ্জাল অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা'র শাসনব্যবস্থার অধীনেই থাকে সেজন্য শান্তি রক্ষার এই আপ্রাণ চেষ্টা দেখানো হোচ্ছে। কিন্তু কোনোভাবেই শান্তি আসে নি, আসবে না, কারণ বিষবৃক্ষে সুমিষ্ট ফল আশা করা

অর্থহীন। যে গাছের বীজ বপন করা হবে সেই গাছই জন্মাবে এবং ফলও তাই হবে। মাকাল ফলের বীজ থেকে তিক্ত মাকাল ফলই হবে, সুমিষ্ট আম হবে না।

Divide and Rule নীতি কেন অশান্তির বীজ তার একটু ব্যাখ্যা দেওয়া যাক। আমরা এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত কোরব।

স্বাধীনতা নামক মরীচিকা

ইহুদি-খ্রিস্টানরা প্রথমে কয়েকশ' বছর ধোরে সমস্ত দুনিয়াকে শাসন ও শোষণ কোরল। পৃথিবীর এক সময়ের সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি থেকে অন্যায়ভাবে সম্পদ লুন্ঠন কোরে এক জায়গায় জড়ো কোরল, ফলে কয়েক বছর পরে ভয়াবহ অর্থনৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি হোল। পুঁজিবাদী সুদভিত্তিক এমন অর্থব্যবস্থা কায়েম কোরল যার অনিবার্য পরিণতিতে গুটি কয়েক লোকের হাতে অগাধ সম্পদের পাহাড় জমে উঠলো আর সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষিজীবী, শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ ভয়াবহ দারিদ্র্যের দিকে নিক্ষিপ্ত হোল, ফলে অসন্তোষ, বিক্ষোভ, অশান্তি দানা বাঁধতে শুরু কোরল। কেউ কেউ বোলতে পারেন মানুষই তো ভাগ হোতে চাইছে। হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে মানুষই ভাগ হোতে চাইছে কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যাবে না, যে মানুষ যখন শোষণ, বঞ্চনা, অবিচারের শিকার হোয়েছে তখনই আলাদা হওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে, পরিণতিতে যুদ্ধ, দাঙ্গা অবশেষে পৃথক ভৌগোলিক রাষ্ট্র গঠন করা হোয়েছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। একই পিতার দশ পুত্র। পিতার সমুদয় সম্পত্তির উপর প্রত্যেকেরই সমান অধিকার রোয়েছে। এখন একজন যদি অধিকাংশ ধন সম্পত্তি দখল কোরে অন্যদের বঞ্চিত করে তখন এক পর্যায়ে অন্য সন্তানেরা একই পরিবারে থাকতে চাইবে না, তারা পিতার সম্পত্তি ভাগ কোরে প্রত্যেকে আলাদা হোয়ে যেতে চাইবে। এটাকেই তারা স্বাধীনতা বোলে মনে কোরবে। কিন্তু এতে যে তারা দুর্বল হোয়ে গেল, একই বাড়িতে কয়েকটি কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি হোল, শুরু হোল প্রতিযোগিতা, কোন্দল, হিংসা, বিষোদগার, অন্যের ভাগের প্রতি লালসার দৃষ্টিপাত ইত্যাদি। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই আরম্ভ হবে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত।

ঠিক এভাবেই দাজ্জাল দুনিয়ার মানবজাতিকে প্রাথমিকভাবে বিভক্ত (Primary Division) করল, স্বাধীনতার (Independence) নামে অসংখ্য ভৌগোলিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, প্রতিটি জাতির

সামনে ভৌগোলিক স্বাধীনতাকে মুক্তির প্রথম নিয়ামক বা উপাদান হিসাবে চিত্রিত করা হোল। মানুষ কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে চোলতে পারে না, বেঁচে থাকার জন্য তাকে প্রকৃতির কাছে যেতেই হয়; অর্থাৎ আল্লাহর কাছে যেতেই হোচ্ছে। আল্লাহ বলেন, সবকিছুই আল্লাহর থেকে সৃষ্ট এবং আল্লাহর কাছেই ফিরে আসবে। যারা আল্লাহর নাম মুখে নিতে দ্বিধা করেন তারা বলেন, প্রকৃতির কাছে ফিরে আসতে হবে। যারা স্বাধীনতার মতবাদের বোদ্ধাজন তাদের প্রতি আমার প্রশ্ন, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, এ্যাস্টরয়েড বেল্টের গ্রহাণু, প্রস্তর, ধূলিকণা (Galactic Body) যতকিছু আছে, এগুলি স্রষ্টার বেঁধে দেয়া অলংঘনীয় যে নিয়মে বাঁধা, যা তার অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য, তারা যদি বলে, ‘আমরা আজ থেকে কোনো বাধা-নিষেধ, নিয়ম মানব না, আমরা স্বাধীন হোয়ে যাব, তাহোলে প্রকৃতিতে কি হবে? এমন বিপর্যয় হবে যে একমুহূর্তের মধ্যে এ দুনিয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। সুতরাং ইচ্ছা কোরলেও আপনি আপনার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য পুরোপুরি স্বাধীন থাকতে পারবেন না। এটা সম্ভব না, এ দাবী করাটাও অপরিণামদর্শী, ভুল। প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে আপনাকে থাকতেই হবে। এই নিয়মকে উপেক্ষা করে দাজ্জাল আবিষ্কার কোরল ভৌগোলিক স্বাধীনতার মতবাদ। পৃথিবীর উপরিভাগ যত টুকরো হবে, সেখানকার জনসংখ্যা ততো শক্তিহীন হবে, তাকে শাসন ও শোষণ করা হবে ততো সহজ। সে কিছু কাল্পনিক সীমারেখা টেনে এই ভাগ কোরল।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এমনভাবে নদ-নদী, খালবিল, পর্বতমালা সৃষ্টি ও স্থাপন করে রেখেছেন যেন কোনোভাবেই একটা থেকে আরেকটাকে আলাদা করা না যায়, কোরলেই ভারসাম্য নষ্ট হয়। একটার সাথে আরেকটা সম্পর্কিত (Interrelated) একটা ছাড়া আরেকটা অর্থহীন। পাহাড় ছাড়া নদী হয় না, নদী ছাড়া খালবিল হয় না, নদী থাকলে সমুদ্রও থাকতে হবে এভাবে সবকিছু নিয়েই প্রকৃতি। পর্বতমালাগুলির উৎপত্তি, বিস্তৃতি এক জায়গায়; সর্বোচ্চ চূড়া আরেক জায়গায়। পর্বতমালা না থাকলে যেমন বৃষ্টি বর্ষণ হবে না, বৃষ্টি বর্ষণ না হোলে যেমন সবুজ গাছপালা জন্মাবে না, নদীতে পানি প্রবাহিত না হোলে সমতলভূমি শস্য শ্যামলা হবে না, জনবসতি গড়ে উঠবে না তেমনি জনবসতি না থাকলে জলাধারগুলিও কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ এমনভাবেই সৃষ্টি কোরেছেন সমস্ত দুনিয়াটাকে যেন কোনোভাবেই ভাগ করা না যায়। কিন্তু দাজ্জাল দুনিয়াটা ভাগ কোরেছে, এর ভারসাম্য ধ্বংস কোরেছে। এখন ভাগটা কিভাবে করা হবে, সূত্র দিয়েছে বিভিন্ন

ভাবে যেমন বর্ণের ভিত্তিতে, ভাষার ভিত্তিতে, সংস্কৃতির ভিত্তিতে, ধর্মের ভিত্তিতে। বোলেছে তোমরা ভাগ (স্বাধীন) হও, শান্তিতে থাকবে, তোমাদের অধিকার তোমরা ফিরে পাবে। কিন্তু প্রশ্ন হোল এই অধিকার কে দেবে? কার কাছ থেকে মানুষ বুঝে নেবে অধিকার? পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহই মানুষের মৌলিক অধিকার সরবরাহ করেন। তাই তিনি রব (পালনকারী), রাজ্জাক (অন্নদাতা, জীবিকা দানকারী) নাম ধারণ কোরেছেন। পৃথিবীকে কর্ষণ কোরে খাদ্য উৎপাদন করার অধিকার তিনি মানুষকে দিয়েছেন, যারা এই অখণ্ড পৃথিবীকে খণ্ড খণ্ড কোরে মানুষকে চাষাবাদ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, তারাই মানুষের মৌলিক অধিকার লুণ্ঠন করে। আজ এভাবে ভাগ কোরতে কোরতে পুরো পৃথিবীকে তারা প্রায় দুইশত ভাগ কোরেছে। শুধু এক আরবকে ভেঙ্গেই করা হোয়েছে ২২ ভাগ। ভারত উপমহাদেশকে ভেঙ্গে ৬ ভাগ কোরেছে। এশিয়াকে ৪৯ ভাগ কোরেছে, ইউরোপকে ৪৭ ভাগ করছে, আফ্রিকাকে ৫৭ ভাগ কোরেছে, উত্তর আমেরিকাকে ৩ ভাগ, দক্ষিণ আমেরিকাকে ১৩ ভাগ কোরেছে। শোনা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রও আর যুক্ত থাকতে পারছে না, সেখানেও ভাগ হওয়ার আওয়াজ উঠছে। কিছুদিন আগে সুদানকে দুই ভাগ করা হোল, আফগানিস্তানকে নাকি কয়েকভাগ করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত। ইরাককে ভাগ করার পরিকল্পনা করা হোচ্ছে, ভারতের কাশমীর ও আসামের স্বাধীনতা সংগ্রাম চোলছে কয়েক দশক ধোরে। এভাবে চলেছে বিভক্তিকরণ প্রক্রিয়া। একই দেশ কোরিয়াকে ভেঙ্গে কোরেছে উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া। এমন আরও আছে। এখন ভাগ করতে করতে ভৌগোলিক সীমারেখা এমনভাবে ভাগ কোরেছে যে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হোয়ে গেছে, অবিচার সৃষ্টি হোয়ে গেছে, যার প্রভাব পড়েছে দুনিয়ার প্রতিটি এলাকায়। যেমন একটি নদীর উৎস পড়েছে এক দেশে, মোহনা পড়েছে আরেক দেশে। একদেশ তার সীমানায় নদীতে বাঁধ নির্মাণ কোরে অন্য প্রতিবেশী দেশকে

পানিশূন্য কোরে ফেলছে, নাব্যতা ধ্বংস কোরছে, আবার যখন ইচ্ছা প্লাবিত কোরছে। জমি ও পানির ভাগাভাগি নিয়ে বহু সীমানায় সংঘাত চিরস্থায়ী রূপ নিয়েছে। এখন দুনিয়ার কর্তৃপক্ষ 'দাজ্জাল' অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টান বস্তুবাদী 'সভ্যতা' অর্থাৎ পাশ্চাত্য প্রভুরা যদি দুনিয়াবাসীকে বলে, 'হে দুনিয়াবাসী! তোমাদেরকে একমাস সময় দেয়া হলো, তোমরা

দেশের সীমানায় নদীতে বাঁধ নির্মাণ কোরে অন্যদেশকে পানিশূন্য কোরে ফেলা প্রকৃতির উপরে এক সাংঘাতিক অবিচার এবং অমানবিকতা। ভৌগোলিক বিভক্তির এটি অন্যতম কুফল।

ভাগ হও। সেনাবাহিনী, সরকার তোমাদেরকে কিছুই বোলবে না, যত পার স্বাধীনতার পতাকা উড়াও।' তাহোলে আমার মনে হয় পৃথিবী কমপক্ষে লক্ষ ভাগ হোয়ে যাবে। প্রতিটি জেলা স্বাধীন হোয়ে যাবে; সেই প্রবণতা পৃথিবীতে ইতোমধ্যে সৃষ্টি হোয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত সরল সূত্র হোচ্ছে- ঐক্যবদ্ধ না হোয়ে, সুশৃঙ্খল না হোয়ে এবং একজন নেতার নেতৃত্ব বিনা পৃথিবীতে কোনো জাতিই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ কোরতে পারে নি। এটা চিরন্তন, শ্বাশ্বত প্রাকৃতিক নিয়ম। আজকের বিশ্বের একক পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র যা ৫২টি অঙ্গরাজ্য নিয়ে গঠিত। যদি ঐক্য ভেঙ্গে প্রতিটি রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করে তবে একদিনের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র নামক পরাশক্তির পতন হবে।

রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য

আর্থিক ও সামাজিকভাবেও ইহুদি-খ্রিস্টান 'সভ্যতা' দুনিয়াটাতে বৈষম্যের স্তর সৃষ্টি কোরল। ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড, সেকেন্ড ওর্য়াল্ড, থার্ড ওয়ার্ল্ড, উন্নত বিশ্ব (Developed country), অনুন্নত বিশ্ব (Undeveloped country), উন্নয়নশীল বিশ্ব (Developing country) ইত্যাদি নাম দিয়ে বহুপ্রকার ভাগ করল। যারা অনুন্নত বিশ্বের দেশ তাদের নাকের সামনে উন্নয়নের মুলো ঝুলিয়ে দেওয়া হয় মোটা অঙ্কের ঋণ বা অনুদান। ঋণের অধিকাংশ অর্থ গলাধঃকরণ কোরতে থাকে রাষ্ট্রের ক্ষমতায় আসীন নৈতিক চরিত্রহীন কিছু মানুষ, সেই ঋণ সুদে চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে একসময় আর পরিশোধের পর্যায়ে থাকে না। ঋণের অর্থ এই অনুন্নত বিশ্বের দেশগুলির ভিক্ষা গ্রহণের প্রবণতাই বৃদ্ধি করে এবং আজীবন ভিক্ষুকের দেশ বানিয়ে রাখে এবং নতজানু ভিক্ষুকদের সহজে শাসন করে।

ধর্মীয় ভাগ

এরপর কোরল ধর্মীয় ভাগ। অনেকে বোলতে পারেন ধর্মীয় বিভক্তি তো আগে থেকেই ছিল। এটা সত্য যে এটা আগে থেকে ছিল, কিন্তু ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা' একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। মাত্র কিছুদিন আগে (প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার সভাপতি ও সাবেক বিচারপতি মার্কেন্ডি কাতজু বোললেন, ১৮৫৭ পর্যন্ত ভারতে সাম্প্রদায়িকতা বোলতে গেলে ছিলই না। হিন্দু ও মোসলেমের মধ্যে পার্থক্য ছিল বটে, কিন্তু শত্রুতার সম্পর্ক ছিল না। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও হিন্দু ও মোসলেম একতাবদ্ধভাবে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কোরেছে। বিদ্রোহ দমনের পরে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দেরকে Divide and Rule অর্থাৎ ঐক্যহীন কোরে শাসন করার নীতি গ্রহণ করেন।" ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু-মোসলেম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যে ব্রিটিশদের সৃষ্টি তার ভুরি ভুরি প্রমাণ দেওয়া যাবে। ইতিহাসে ফকীর আন্দোলন ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বোলে যে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের কথা জানা যায়, সেটা আসলে একই বিদ্রোহের দু'টি নাম। এতদ অঞ্চলের হিন্দু এবং মোসলেম শাসক ও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও উভয় সম্প্রদায়ের প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ শাসকের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল, যে

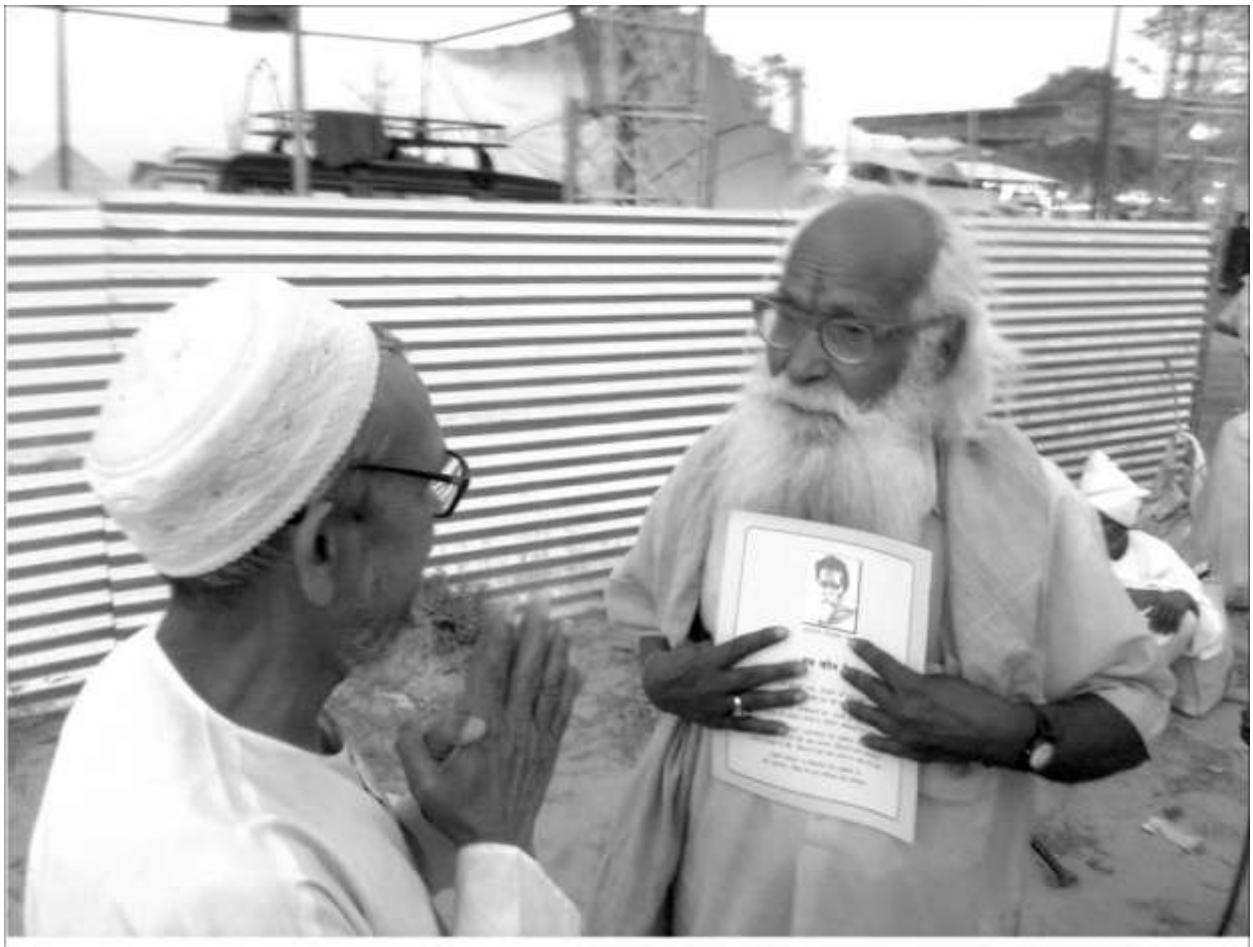

আগের দিনে হিন্দু ও মোসলেমদের মধ্যে এমন বন্ধুভাবাপন্ন সম্পর্কই বিরাজ কোরত, তারা পরস্পরকে সম্মান কোরতো কিন্তু বর্তমানে প্রায়ই তাদের একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন মনোভাবের দৃষ্টান্ত দেখা যায়, দাঙ্গাও হয় অহরহ। এই বিভেদটা সৃষ্টি কোরেছে ইহুদি-খ্রিস্টান 'সভ্যতা' বা দাজ্জাল।

বিদ্রোহই পরবর্তীতে সিপাহী বিদ্রোহে রূপ নেয়। এ সময়ের কথা পাঠককে স্মরণ কোরিয়ে দিতে কাজী নজরুলের একটি লাইন উদ্ধৃতি কোরছি।

হিন্দু না ওরা মুসলিম ঐ জিজ্ঞাসে কোন্ জন?

কাণ্ডারি বলো, 'ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার'।

অর্থাৎ ভেদাভেদ তৈরীর যে প্রচেষ্টা ব্রিটিশ সরকার নিয়েছিল তার বিরুদ্ধে এই কথাগুলি ছিল কবির সাহসী উচ্চারণ। তারা এই উপমহাদেশকে আপাতঃ স্বাধীন কোরে চোলে গেলেও যাওয়ার আগে ধর্মের ভিত্তিতে পাক-ভারতকে ভেঙ্গে ভাগ ভাগ কোরে রেখে যায় যে ভাগগুলি বিগত বছরগুলিতে নিজেদের মধ্যে বহু যুদ্ধ কোরেছে এবং

আজও একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত। এমনকি নিজেদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার দাবিতেও সংগ্রামে লিপ্ত রোয়েছে বহু মানুষ। এভাবে অশান্তি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ কোরেছে।

মতবাদ নিয়ে মতান্তর

দাজ্জাল অর্থাৎ পাশ্চাত্য ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা' ধর্মনিরপেক্ষতা তথা ধর্ম হীনতার উপর ভিত্তি কোরে বেশ কয়েকটি জীবনব্যবস্থা মানবজাতির উপরে প্রয়োগ কোরেছে। যখন দাজ্জাল জন্মলাভ করে তখন দুনিয়াময় প্রতিষ্ঠিত ছিল রাজতন্ত্র। ইউরোপের মধ্যযুগে রাজারা সিংহাসনে বোসলেও তারা চার্চ তথা খ্রিস্টধর্মের পুরোহিতবর্গের কাছে একরকম জিম্মি ছিলেন, ফলে চার্চ ও রাজার দ্বৈতশাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হোচ্ছিল জনগণ। যেহেতু খ্রিস্টধর্মের গ্রন্থ বাইবেলে কেবলমাত্র মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয়ে আলোচনা করা হোয়েছে, সেখানে কোনো শরিয়ত অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন, অর্থনীতি, দণ্ডবিধি কোনো কিছুই নেই তাই বাইবেল দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তবু গীর্জার প্রতাপ ছিল অপরিসীম। রাজতন্ত্র ও চার্চতন্ত্রের দ্বন্দ্ব যখন চরম আকার ধারণ করে তখন ১৫৩৭ সনে ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরী চার্চের

ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরী (১৪৯১-১৫৪৭)

প্রশাসনিক অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের অধিকারকে বিলুপ্ত কোরে নিজের শাসনদণ্ডকে নিরঙ্কুশ করেন। কিন্তু ধর্মবিশ্বাস মানুষের মন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে দেয়া অর্থাৎ পুরো মানবজাতিকে নাস্তিক বানানো সম্ভব নয়। তাই ধর্মকে নির্বাসন দেওয়া হয় ব্যক্তিগত জীবনের সংকীর্ণ পরিসরে, আজও তেমনই আছে। ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ মানেই হোল ধর্ম যার যার ব্যক্তিজীবনে থাকবে, জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে এর কোনো হস্তক্ষেপ চোলবে না। এই ধারণা এসলামে অসম্ভব কারণ এসলাম খ্রিস্ট ধর্মের মত কেবল মাত্র মানুষের আধ্যাত্মিক দিক নিয়ে কাজ করে না,

এসলাম মানুষের দেহ ও আত্মা উভয় অঙ্গনের বিধান সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা (Complete code of life)। ব্যক্তিজীবনে এসলামের কিছু মানা আর জাতীয় জীবনে না মানা শেরক এবং কুফর। বর্তমানে মোসলেম নামের এই জনসংখ্যাটি ধর্মকে ব্যক্তিজীবনে গ্রহণ ও জাতীয় জীবনে পরিত্যাগ কোরে শেরক ও কুফরে নিমজ্জিত হোয়ে আছে। যাহোক, ধর্মকে একেবারে মুছে ফেলতে না পেরে তাকে ব্যক্তিজীবনে নির্বাসনের মধ্য দিয়ে জন্ম হোল দাজ্জালের। ইংল্যান্ডের পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত খৃষ্টান জগৎ এই নীতি গ্রহণ ও প্রয়োগে বাধ্য হোল। এর পর থেকে খ্রিস্টান জগতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, এক কথায় জাতীয় জীবনে এই মহাবিশ্বের স্রষ্টার আর কোনো কর্তৃত্ব রোইলো না। এর পর ইউরোপীয় খ্রিস্টানরা ক্রমেই বস্তুবাদী (Meterialistic) হোয়ে পোড়তে শুরু কোরলো। এটা একটা পরিহাস (Irony) যে, যে জাতির সকল লোক এমন একটি ধর্ম গ্রহণ কোরলো যে ধর্মের মূলমন্ত্রই হোচ্ছে আত্মশুদ্ধি, কেউ এক গালে চড় দিলে তাকে অন্য গাল পেতে দাও, জোর কোরে গায়ের কোট খুলে নিলে তাকে আলখেল্লাটাও দিয়ে দাও, সেই জাতি একটি কঠোর বস্তুবাদী সভ্যতার জন্ম দেবে। এরপর ধীরে ধীরে মানবরচিত জীবনব্যবস্থাগুলি পরিণত রূপ লাভ কোরতে থাকে। এই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রাথমিকভাবে রাজতান্ত্রিক পরিমণ্ডলে প্রযুক্ত হোলেও এক সময় বাজতে আরম্ভ করে রাজতন্ত্রের বিদায়ঘণ্টা, জন্ম নেয় ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র, যার মূলসূত্র পুঁজিবাদ। এই গণতন্ত্র ইউরোপে ধীরে ধীরে রূপ লাভ কোরল চরম ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রে। দেখা দিলো ভয়াবহ অর্থনৈতিক অবিচার, ধনী- দরিদ্র ব্যবধান। এই অর্থনৈতিক অন্যায় থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ইহুদি পণ্ডিত কার্ল মার্কস আবিষ্কার কোরলেন পুঁজিবাদবিরোধী সাম্যবাদ (Communism)। প্রতিষ্ঠিত পুজিবাদ ভিত্তিক সামন্তবাদের বিরুদ্ধে গণজাগরণ সৃষ্টি কোরে রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয় ইহুদি পণ্ডিত কার্ল মার্কসের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ। পাশাপাশি বিশ্বের কয়েকটি প্রভাবশালী দেশে একনায়কতন্ত্র প্রবল হোয়ে সাম্রাজ্যবাদী হোয়ে উঠলো। বাকি দুনিয়া তাদেরকে আখ্যায়িত কোরল ফ্যাসিস্ট হিসাবে। এক পর্যায়ে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র আঁতাত কোরে দুটি বিশ্বযুদ্ধ কোরে হিটলার ও মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদ পরাজিত কোরল কিন্তু দুনিয়া থেকে একনায়কতন্ত্র একেবারে মুছে গেল না, পেছনের সারিতে গিয়ে অবস্থান নিল। তারপর পৃথিবী প্রধানত দুই মেরুতে বিভক্ত হোয়ে গেল- এক প্রান্তে

সমাজতন্ত্র অন্য প্রান্তে গণতন্ত্র। কোথাও কোথাও গণতন্ত্রের ধড়ের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের লেজ জুড়ে সাধারণ মানুষকে গিনিপিগ কোরে অদ্ভুত কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হোল। কিন্তু কোনো ব্যবস্থাই মানুষকে কাঙ্ক্ষিত শান্তি দিতে সক্ষম হোল না। পুঁজিবাদে দেশের জনগণের অধিকাংশ সম্পদ গুটিকয় মানুষের হাতে পুঞ্জিভূত হয়, বঞ্চিত হয় অধিকাংশ মানুষ, সমাজতন্ত্রেও তাই। দেশের সব সম্পদ জড়ো হয় সরকারের তহবিলে, বঞ্চিত হয় সেই অধিকাংশ মানুষ। সুতরাং অবধারিতভাবে আবারও ঘটে সহিংস বিপ্লব, অভ্যুত্থান- যা কখনও সামরিক, কখনও বেসামরিক। বিংশ শতক জুড়ে চলে সমাজতন্ত্রের আধিপত্য যা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ অকাতরে জীবন দিয়েছে। অবশেষে নব্বইয়ের গোড়ার দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভক্তি ও জার্মানের বার্লিন প্রাচীরর ধ্বংসের মাধ্যমে দ্বিতীয় কাতারে গিয়ে দাঁড়ায়, প্রথম সারিতে আসে গণতন্ত্র। বিশ্বের মোড়লিপনা থেকে ছিটকে পড়লেও সমাজতন্ত্র মতবাদ হিসাবে বেশ শক্তিশালী এখনও। সমাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে প্রবেশ করা যে কড়াই থেকে চুলাতে লাফ দেওয়া তা এখন সকলের সামনেই দিনের আলোর মত পরিষ্কার হোয়ে গেছে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশে অন্যায়, অশান্তি, অবিচারের লেলিহান শিখা প্রজ্জ্বলিত হোয়ে আছে। এ সবগুলি জীবনব্যবস্থা মানবজাতির মধ্যে এমন একটি হ-য-ব-র-ল পরিবেশ সৃষ্টি কোরে রেখেছে যে ভৌগোলিক রাষ্ট্রগুলি তো বটেই, এমনকি প্রত্যেকটি দেশের মানুষ পৃথক পৃথক মতবাদে বিশ্বাসী, একই মতবাদের মধ্যেও আবার রোয়েছে দ্বিধাবিভক্তি। যেমন সমাজতন্ত্রের মধ্যে রোয়েছে মাওবাদ, লেলিনবাদ ইত্যাদি। গণতন্ত্রীদেরও ভাগ আছে যেমন- উদারপন্থী (Liberal), রক্ষণশীল (Conservative), প্রজাতান্ত্রিক (Republican) ইত্যাদি। অদ্ভুত ব্যাপার হোল গণতন্ত্র সরিসৃপের মত তার রূপ পরিবর্তন কোরে রাজতন্ত্রের সঙ্গেও থাকে, সামরিকতন্ত্রের সঙ্গেও থাকে, সমাজতন্ত্রের সঙ্গেও থাকে। এভাবে বিশ্বের কোনো দেশ গনতন্ত্র, কেউ রাজতন্ত্র, কেউ সমাজতন্ত্র, কেউ সাম্যবাদ ইত্যাদি গ্রহণ কোরে বিভক্ত হোয়ে আছে। এভাবেই মানবজাতি দাজ্জালের মতবাদগুলিকে আশ্রয় কোরে বহু ভাবে বিভক্ত হোয়ে আছে।

মুদ্রার মানের তারতম্য

পৃথিবীকে টুকরো টুকরো কোরে ভাগ করার চূড়ান্ত পরিণতি কি? এর অনিবার্য পরিণতি হোল: এক পিতা-মাতা আদম ও হাওয়া (আ:) থেকে আগত সন্তানদের মধ্যে সৃষ্টি হবে--আমি আমরা, তুমি তোমরা। তৈরী হবে সীমানা, প্রাচীর। তারা পরস্পর হবে পরস্পরের জাতশত্রু। প্রত্যেকটা সীমানার মধ্যে এবার নিজস্ব সরকার ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ভাগ, নিজস্ব মুদ্রা ব্যবস্থা চালু হলো। এবার পানি, বাতাস, আলো

মুদ্রার মানের তারতম্যের ফলে উন্মুক্ত হোয়েছে হুণ্ডি ব্যবসা, মানি লন্ডারিং, মুদ্রা পাচার, চোরাকারবারী, ভিসা পাসপোর্ট জালিয়াতি, নোট জালিয়াতি ইত্যাদি অপরাধের দুয়ার।

ইত্যাদির মতো মানুষদেরও চলার পথ প্রয়োজন হবে। সীমানা তৈরী হোলে পরে তা ভাঙ্গার প্রবণতাও দেখা দেয়। তার প্রমাণ দুই জার্মানি, দুই কোরিয়া, দুই সুদান। মানুষের প্রয়োজনই এই প্রবণতা সৃষ্টি করে। আল্লাহ সবকিছু একজায়গায় রাখেন নি, তাই একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায় কিছু মানুষকে বন্দী করলে তারা তো আর সব কিছু সেখানে পাবে না, তাকে অন্য জায়গায় পাড়ি দিতে হবে। এই বিভাজনের ফলে সম্পদের বন্টন হোচ্ছে ভারসাম্যহীন, এক স্থানে বিরাট সম্পদের অধিকারী

অন্যস্থানে দারিদ্র্য সৃষ্টি হোয়েছে। অনিবার্যভাবেই আসছে মুদ্রার ফারাক- ডলার, রিয়াল, ইউরো, রুবল, টাকা, রুপি ইত্যাদি। মানুষের মতো মুদ্রাও ইচ্ছা করলে সীমানায় আটকা পড়লো। সীমানা ডিঙ্গাতে গেলে তার মান-হানী হয়। এর ফলে উন্মুক্ত হোল হুন্ডি ব্যবসা, মানি লন্ডারিং, মুদ্রা পাচার, চোরাকারবারী, ভিসা পাসপোর্ট জালিয়াতি, নোট জালিয়াতি ইত্যাদি অপরাধের দুয়ার।

ধর্মীয় দল উপদল

হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কত যে ভাগ আছে তা বোলতে গেলে লেখা অনেক দীর্ঘ হোয়ে যাবে। এক এলাকায় যে দেবতার পূজা করা হয়, অন্য এলাকায় সেই দেবতার নামও অজানা। হৃদয় বিদারক বর্ণভেদ প্রথা আজও হিন্দু সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে। খ্রিস্টানরা তো শুরুতেই দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ হোয়ে গেল: ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট। মোসলেমরা হোল শিয়া, সুন্নি, হানাফি, সালাফি, ওহাবী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী। শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে দাজ্জাল এই বিভক্তি গুলিকে জাতিগুলির আত্মায় একেবারে পাকাপোক্ত কোরে দিল। মাদ্রাসাগুলিতে এই শিয়া ও সুন্নি মতবাদ, বিভিন্ন এমামের মতবাদগুলিকে আলাদাভাবে শেখানো হোল ফলে এই শিক্ষায় শিক্ষিতরা চিরকালের তরে একে অপরের শত্রু বনে গেল। একটি বিষয়ের নামই রাখা হোল তর্কশাস্ত্র। অর্থাৎ যত পার মত তৈরী কর, যত পার পথ তৈরী কর। পথ-মত তৈরী কোরতে কোরতে এখন এক এসলামেই হোল হাজার হাজার ভাগ, মত, ফেরকায় বিভক্ত। সারা বিশ্বে মারেফতি তরিকাগত বিভক্তি যে কত আছে তার হিসাব নেই, চিশতীয়া, কাদেরিয়া, মোজদ্দেদিয়া, নকশবন্দিয়া পীরের অনুসারীদের মধ্যে এক পীর আরেক পীরের অনুসারীদের শুধু বিরোধিতা, বা ঘৃণাই করে না হামলা করে হতাহত পর্যন্ত কোরছে। ভৌগোলিক সীমা থেকে ধর্মীয় সীমারেখা আরো মারাত্মক। ভৌগোলিক সীমারেখা যাও গুলি খেয়ে, ড্রামের ভিতরে ঢুকে, লাশের গাড়িতে কোরে হলেও পার হওয়া যায়, কিন্তু এই ধর্মীয় সীমানা কোনো অবস্থাতেই পার হওয়া যায় না। একজন খ্রিস্টানকে বৌদ্ধ বানানো বা হিন্দুকে মুসলমান বানানো যতটা না কঠিন, একজন শিয়াকে সুন্নি বানানো বা সুন্নিকে শিয়া বানানো তার চাইতে কঠিন। বিষয়টা এখানে শেষ হোলে না হয় কথা ছিল, কিন্তু প্রতি বছর শুধুমাত্র শিয়া, সুন্নি সংঘর্ষে কত হাজার লোক যে নিহত হয় তার হিসাব কয়জনে রাখে? কি নিদারুণ পরিহাস।

এ জাতি নিজেরাই হাজার হাজার মাজহাব ফেরকা তরিকায় বিভক্ত হোয়ে কুফর কোরেছে এবং নিজেদের মধ্যে নানামুখী সংঘাত-সংঘর্ষে লিপ্ত হোয়ে আছে। পাকিস্তানে শিয়া-সুন্নি দাঙ্গায় নিহত ব্যক্তিদের উভয়পক্ষই মোসলেম দাবিদার। অথচ আল্লাহর রসুল বোলেছেন, ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে নিহত উভয়পক্ষই জাহান্নামী।

রাজনৈতিক বিভক্তি

এবার একই দেশের জনগণের মধ্যে তোলা হোল রাজনৈতিক মতবাদের প্রাচীর। প্রতিটি রাষ্ট্রে আদর্শগত তারতম্যের প্রেক্ষিতে তৈরী করা হোল গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক বিভেদ। কী অকল্পনীয় অর্থ ব্যয় কোরে দাঙ্গা হাঙ্গামা কোরে অস্থিরতার মাধ্যমে একটি দল ক্ষমতায় আরোহণ করে। ইদানীং আবার একক দল ক্ষমতায় যাওয়ার মত জন সমর্থন না পেয়ে সমমনাদের নিয়ে জোট গঠন কোরে ক্ষমতায় যায়। যদিও সমমনা বলা হয় কিন্তু বাস্তবে সমমনাতো নয়ই, বরং এক দল আরেক দলের এমন শত্রু যে সুবিধা আদায়ের একটু হেরফের হোলেই হেঁচকা টানে সরকারের পতন ঘটায়, এ জন্য প্রায়ই সরকারগুলি স্থিতিশীল হয় না, মেয়াদ পূর্ণ কোরতে পারে না। একটি সরকার কোনো একটি প্রকল্প বা প্রক্রিয়া শুরু কোরতে না কোরতেই তার মেয়াদ শেষ হোয়ে যায়, অপর সরকার এসে বহুক্ষেত্রে সেই প্রক্রিয়া স্থগিত কোরে দেয়। [কিন্তু এসলামে সরকারের নির্দিষ্ট কোনো সময়কাল বা মেয়াদ (Tenure) নেই। একজন শাসক যতদিন আল্লাহর হুকুম মোতাবেক জনগণকে শাসন কোরবে ততদিন সে শাসকের পদে থাকবে।]

দাজ্জালের তৈরি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ইত্যাদি মতবাদের বিষাক্ত নেশায় এ জাতি এতটাই আচ্ছন্ন যে রাজনৈতিক হানাহানিতে এভাবে পশুর মত পিটিয়ে মানুষ মেরে ফেলার দৃশ্য আমাদের প্রায়ই দেখতে হয়। সরকার বদলায় কিন্তু অবস্থা বদলায় না।

কিন্তু কেউই শান্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয় না, কারণ পেছনে লেগে থাকে বিরোধী দল। তারা সরকারের ঘুম হারাম কোরে দেওয়ার জন্য চূড়ান্ত চেষ্টা করে। গণতন্ত্রে বিরোধী দল নামক শত্রুদল না থাকলে চোলবে না, সেটা নাকি স্বৈরতন্ত্র হোয়ে যায়। এখন বিরোধীদল কয়টা থাকবে, একটা না দশটা এর কোনো নির্দিষ্টতা নেই। কোনো কোনো দেশে দেখা যায় কয়েকশ' দল আছে সরকারের বিরুদ্ধে, সরকারের সমর্থকের চেয়ে বিরোধীই বেশী, দেশের অধিকাংশ মানুষ সরকারের বিরোধি হোলেও সেই সরকার 'গণতান্ত্রিক'। আবার বিরোধিদলীয় জোট তৈরীরও ব্যবস্থা রাখলো। বিরোধী দলের কাজই হোচ্ছে সরকারের ভালো মন্দ সব কাজের বিরোধিতা করা। এটা এমন এক চক্রান্ত যা দিয়ে তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিবাদ কলহ মারামারি ইত্যাদি জিইয়ে রাখে।

কারাগারেও বিভক্তি

সামান্য চুরির অপরাধে একজন সাধারণ মানুষ এমন গাদাগাদি কোরে কি অমানবিকভাবে থাকে যা বাইরের কেউ ভাবতেও পারবে না। দশজনের রুমে একশত জন, আর মন্ত্রীরা পুকুর চুরি কোরে পায় 'ডিভিশন–Division'। 'আইনের চোখে সবাই সমান' এ আপ্তবাক্য সংবিধানের পাতাতেই রোয়ে যায়। দাজ্জালের মাধ্যমে এবলিস এখন প্রতিটি ক্ষেত্রে পৃথকীকরণ কোরে অবস্থা এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, মানুষ যেন কোনো ক্ষেত্রেই ঐক্যে আসতে না পারে।

চাকুরীক্ষেত্রে বিভক্তি

চাকুরিতেও রাখা হোল বিভিন্ন গ্রেড, বিভিন্ন বেতন কাঠামো। বেতন কাঠামোয় প্রথম গ্রেডের মাসিক বেতন দেড়, দুই লক্ষ থেকে শুরু কোরে নিুতম গ্রেড দুই, তিন হাজারের করা হোল। কেউ বাড়ী, গাড়ী শান–শওকত, কাজের লোক, সরকারী সুযোগ সুবিধা পেলো আর কারো একেবারে না খেয়ে মরার অবস্থা, ফলে খুঁজতে হয় দুর্নীতি করার অজুহাত, আইনের ফাঁক ফোকর। সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মধ্যেও প্রতিষ্ঠা করা হোল আনুষ্ঠানিক বিভেদ। সরকারি কর্মচারীরা কোরল ইউনিয়ন আর অফিসাররা কোরল ক্লাব। এদের মধ্যে বিভিন্ন বৈষম্য তৈরী কোরে সৃষ্টি করা হোল অনিবার্য বিরোধ। পারস্পরিক সম্পর্ক এমন হোয়ে দাঁড়ালো যে কর্মচারী পারলে

অফিসারকে গাড়ি চাপা দিয়ে মারে। শুধু তাই নয় দাবি আদায়ের নামে শ্রমিক কর্মচারীরা এমন আচরণ করে অফিসার নামের ভদ্রলোক বেচারার ইজ্জত, সম্মান আর কিছুই থাকে না। এই বিভক্তি, ভাগ Division যেখানে, সেখানে কিভাবে উন্নতি হয়, প্রগতি হয়। সরকারী-বেসরকারী সকল চাকুরিক্ষেত্রে চলে ভয়াবহ দুর্নীতি, এমন দুর্নীতি করে যে, কর্মকর্তারা নিজের আখের গোছাতে দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেন, যাকে প্রচলিত ভাষায় দেশ বিক্রী আখ্যা দেওয়া হয়। এদের আবার ধরার জন্য তৈরি দুর্নীতি দমন কমিশন। মজার ব্যাপার হোল দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও হয় দুর্নীতি মামলা।

সামরিক বেসামরিক বিভক্তি

বর্তমানে পৃথিবীর সব জাতিই প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত। সামরিক ও বেসামরিক (Military & Civilian)। বেসামরিক ভাগ সরকার গঠন কোরে নিজেরা আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি ইত্যাদি তৈরি কোরে সেই মোতাবেক দেশ শাসন করে অর্থাৎ এসলামের দৃষ্টিতে শেরক ও কুফরী করে, আর সামরিক ভাগ বেসামরিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে সেনা ছাউনীতে থেকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেয় দেশকে রক্ষা করার, প্রয়োজনে অর্থাৎ বেসামরিকদের সিদ্ধান্ত হোলে অন্য দেশ-জাতিকে আক্রমণ করার জন্য। বর্তমানে নিজেদের মূল থেকে, আকীদা থেকে, দীন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, আল্লাহ-রসুলের দেখানো দিক নির্দেশনার (হেদায়াহর) বিপরীতমুখে চলমান এই মোসলেম জাতিও অন্যদের অনুকরণে ঐ দু'ভাগে বিভক্ত। কিন্তু আমরা ইতিহাসে দেখি আল্লাহর শেষ নবী যে জাতি গঠন কোরলেন, যার নাম উম্মতে মোহাম্মদী, এটার মধ্যে কোনো ভাগ ছিল না; সম্পূর্ণ জাতিটাই সামরিক (Military) ছিল। কারণ যে জাতির উপর আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্বই ছিল সংগ্রাম কোরে সমস্ত পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করা এবং এই দীনের সর্বোচ্চ পুরস্কার রাখা হোয়েছে দীন প্রতিষ্ঠা কোরতে গিয়ে সংগ্রামে প্রাণ উৎসর্গকারীর অর্থাৎ শহীদদের কাজেই এ জাতির সর্বোচ্চ নেতা থেকে নিুতম মানুষটি পর্যন্ত প্রত্যেকে ছিলেন মোজাহেদ, যোদ্ধা। যে যোদ্ধা নয় এ জাতিতে, এই উম্মাহতে তার স্থান নেই। এ জাতিতে নির্বাচিত সংসদ (Parliament) ছিল না। কারণ আইন তৈরির কোনো প্রয়োজন নেই; আল্লাহর দেয়া আইন-কানুন দণ্ডবিধি, অর্থনীতি সমস্তই মজুদ আছে; এবং আছে শুধু এমাম এবং

এমামের নিযুক্ত স্থানীয় আমীররা (Commanders) আল্লাহর ঐ আইন কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি ইত্যাদি অর্থাৎ দীনুল এসলামকে প্রতিষ্ঠিত কার্যকরী রাখার জন্য। সমস্ত জাতির প্রতিটি নারী ও পুরুষের লক্ষ্য এক, উদ্দেশ্য এক, ঐক্য, শৃঙ্খলা, নেতার আনুগত্য সবই এক। এক কথায় সমস্ত জাতিটি ছিল একটি সামরিক বাহিনী, নারী-পুরুষ প্রত্যেকে এক একটি সৈনিক, মোজাহেদ, যোদ্ধা। উম্মতে মোহাম্মদী নামক এই সামরিক বাহিনীর একমাত্র প্রশিক্ষণ হোল সালাহ্ (নামাজ)। দৈনিক পাঁচবার নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হোয়ে লাইন সোজা কোরে একজন আমীরের (Commander) নির্দেশে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ১১৪টা নিয়ম অনুসরণ কোরে যে সালাহ কায়েম কোরতে হয় তা পৃথিবীর কেবল একটি জিনিসের সাথেই মেলে তা হোল সামরিক বাহিনীর কুচকাওয়াজ।

বর্তমানে পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশ-জাতিগুলিতে যে বেসামরিক ও সামরিক (Civil & Military) বিভক্তি আছে তাতে বেসামরিক ভাগের প্রধান থাকেন প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী এবং সামরিক ভাগের প্রধান থাকেন- প্রধান সেনাপতি (Commander in Chief)। বেসামরিক লোকজন যখন প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীর সামনে যায় তখন তারা সম্মুখে ঝুঁকে, জুবুথুবু, ন্যুব্জ হোয়ে সম্মান প্রদর্শন করে; আর অন্য ভাগের সৈনিকেরা যখন প্রধান সেনাপতির সামনে যায় তখন সে লোহার রডের মত পিঠ, ঘাড় সোজা কোরে দৃপ্তপদে খট্ খট্ কোরে সেনাপতির সামনে যায় এবং যেয়ে তড়াক কোরে স্যালুট করে এবং সোজা হোয়ে দাঁড়িয়ে আদেশের অপেক্ষা করে এবং আদেশ হোলে প্রাণদিয়ে তা পালন করে। এই উম্মতে মোহাম্মদীতে যেহেতু ঐ বিভক্তি ছিল না, সম্পূর্ণ জাতিটাই সামরিক, এতে কোনো প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ছিল না, ছিলেন শুধু এমাম (Commander in Chief) এবং আমীরগণ, (আমীর শব্দের আক্ষরিক অর্থই হোল আদেশদাতা, (Commander) কাজেই তার সালাহ্র হবে সৈনিক, যোদ্ধার মত। **বেসামরিক লোকজন প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী সামনে যেয়ে জুবুথুবু, ন্যুব্জ নত হোয়ে সালাম দেয় কিন্তু ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থের প্রয়োজনে প্রেসিডেন্টের বা প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধাচারণ কোরে তাদের গদী থেকে অপসারণের চেষ্টা করে; কিন্তু যে সৈনিকরা দৃপ্তপদে সেনাপতির সামনে যেয়ে সোজা হোয়ে মাথা উঁচু কোরে সালাম দেয়, তারা কখনও সেনাপতির কোনো আদেশের বিরুদ্ধে তো যায়ই না, তার আদেশের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে।**

যতদিন এসলামের প্রকৃত আকীদা জাতির মধ্যে ছিল অর্থাৎ জাতি প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী ছিল ততদিন এই জাতির-নারী পুরুষ, জওয়ান-বৃদ্ধ কেউই বে-সামরিক (Civilian) ছিলেন না, পুরো জাতিটিই ছিল যোদ্ধা। জাতির যে কোনো প্রয়োজনে এমাম অর্থাৎ জাতির নেতা যখন আহ্বান কোরতেন তখন সঙ্গে সঙ্গে জাতির সকল নারী, পুরুষ সাড়া দিতেন, কারণ তাঁরা জানতেন নেতার হুকুম মানা ফরদ, অবশ্য কর্তব্য, এটা আল্লাহরও হুকুম (সূরা নেসা ৫৯) । কাজেই এতে কোনো মতভেদের প্রশ্নই ছিল না। ঐ কার্য সমাধা হওয়ার পর তারা আবার যার যার ঘরে স্বাভাবিক

বেসামরিক লোকগুলি মাথা নিচু কোরে সম্মান জানায় রাষ্ট্রের কর্তা ব্যক্তিদের কিন্তু সেই কর্তা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জুতো তুলতেও দ্বিধা করে না এমনকি তারা আন্দোলন কোরে ঐ কর্তা ব্যক্তিকে পদচ্যুত করে কিন্তু সামরিক ভাগ রডের মতো সোজা হোয়ে সম্মান জানায় এবং প্রয়োজনে ঐ রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত থাকে।

জীবনে ফিরে যেতেন। মোসলেম জাতির প্রতিটি মানুষ তার নিজের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে যত খুশি অস্ত্র রাখতে পারতো, কোনো লাইসেন্স লাগতো না। তথাপিও সমাজে এমন শান্তি বিরাজ কোরত যে মাসের পর মাস আদালতে অপরাধ সংক্রান্ত কোনো মামলা আসতো না। সমাজের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তখন আলাদা কোনো আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও প্রয়োজন ছিল না। তবু সেই সমাজে মানুষের এমন নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হোয়েছিল যে, একজন যুবতি মেয়ে অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় একা

শত শত মাইল পথ পাড়ি দিত। তার মনে কোনরূপ ক্ষয় ক্ষতির আশঙ্কাও জাগ্রত হোত না। এটাই হোচ্ছে প্রকৃত এসলামের ফল।

কিন্তু মহানবীর (দ:) এন্তেকালের ৬০/৭০ বছর পর যখন এই জাতির আকীদা বিকৃত হোয়ে গেল, তারা ভুলে গেল যে কী উদ্দেশ্যে তাদেরকে একটি জাতি হিসাবে সৃষ্টি করা হোয়েছে, তখন তারা আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম ত্যাগ কোরল। তাদের সামনে থেকে সারা দুনিয়াতে দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সোরে গিয়ে সেখানে জায়গা কোরে নিলো রাজ্যজয়ের যুদ্ধ। আল্লাহর খেলাফত রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হোল। রাজা বাদশাহরা তাদের দায়িত্ব ভুলে শান শওকতের সঙ্গে রাজত্ব কোরতে লাগলো। সাধারণ মানুষও তাদের নেতাদের এই রসুলাল্লাহর শিক্ষা পরিপন্থী আচরণ দেখে তাদের উপর আস্থা হারাতে লাগলো। সুতরাং এ জাতীয় কোনো কাজে ডাকলে তারা আর আগের মত আল্লাহর এবাদত মনে কোরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজার আহ্বানে সাড়া দেয় না, বরং সুযোগ পেলেই

এসলামে সামরিক বেসামরিক কোনো ভাগ নেই, উম্মতে মোহাম্মদী জাতিটিই ছিল একটি সামরিক বাহিনী, নারী-পুরুষ প্রত্যেকে এক একজন সৈনিক, মোজাহেদ, যোদ্ধা। উম্মতে মোহাম্মদী নামক এই সামরিক বাহিনীর একমাত্র প্রশিক্ষণ হোল সালাহ্ (নামাজ)। রসুলাল্লাহর শিক্ষা মোতাবেক কাতার ধনুকের ছিলার ন্যায় সোজা কোরে, ঘাড়, মেরুদণ্ড সোজা কোরে একজন নেতার হুকুমে ওঠা-বসা, ডানে-বাঁয়ে না তাকিয়ে নেতা বা কমান্ডারের তাকবিরের আনুগত্য কোরে, ফরদ, সুন্নাহ, নফল, ছোট-বড় প্রায় ১১৪ টি নিয়ম কানুন মেনে যেভাবে সালাহ কায়েম কোরতে হয় তার বাহ্যিক দৃশ্য পৃথিবীর একটা মাত্র কাজের সাথে হুবহু মিলে যায় তা হোল সামরিক বাহিনীর কুচকাওয়াজ।

বিদ্রোহের ঝাণ্ডা ওড়ায়। এদিকে বিশ্বের বিভিন্ন এলকায় ছড়িয়ে পড়েছে দিগি¦জয়ী মোসলেম সেনাবাহিনী। রাজা বাদশাহরা এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে তাদের আরাম আয়েশ ও ভোগবিলাসকে টিকিয়ে রাখার জন্য যুদ্ধ অব্যাহত রাখলো, সেই যুদ্ধের উদ্দেশ্য আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে হোয়ে দাঁড়ালো নিছক পরসম্পদ লুন্ঠন ও রাজ্যবিস্তার। যেহেতু রাজতন্ত্র তাই শুরু হোল প্রাসাদ ষড়যন্ত্র; সেই সঙ্গে গুপ্তঘাতক ও শত্রুর হামলার আশঙ্কাও বেড়ে গেল। কাজেই এই রাজা বাদশাহদের দরকার পড়লো নিজস্ব সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনীর। কিন্তু পাবে কোথায়? জনগণ তো আর এসব কাজে স্বেচ্ছায় শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সাড়া দেয় না। তাই অর্থের বিনিময়ে সৈন্য জোগাড় কোরে নিরাপত্তাবাহিনী ও সেনাবাহিনী গঠন করা হোল। এদের মাধ্যমেই রাজারা পর সাম্রাজ্য দখল ও নিজেদেরকে নিরাপদে রাখার চেষ্টা কোরত।

তখন বিশ্বের অন্যান্য রাজতন্ত্রের মতই এই জাতিতেও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ থেকে পৃথক একটি বেতনভুক্ত সেনাবাহিনী সৃষ্টি করা হোল। স্বভাবতই সাধারণ মানুষ নামেরও একটি শ্রেণী সৃষ্টি হোল। যেহেতু শাসকরা আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ত্যাগ কোরেছে কাজেই সাধারণ মানুষ এর পক্ষে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে অংশ নেওয়ার সুযোগ সঙ্কীর্ণ হোয়ে গেল, তবে তাদের যোদ্ধা চরিত্র একেবারে চোলে গেল না। এর কয়েক শ' বছর পরে যখন ইউরোপিয় শক্তিগুলি সমগ্র পৃথিবীকে পদানত কোরল, তখন মোসলেম জাতির কিছু লোকের দ্বারা প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হোল। কিন্তু জাতিগতভাবে জেহাদত্যাগের শাস্তি হিসাবে (সূরা তওবা ৩৯) আল্লাহ তাদেরকে ইউরোপিয়ান খ্রিস্টানদের গোলাম বানিয়ে দিলেন। মোসলেম জাতিটি খ্রিস্টানদের পদানত হওয়ার পর ইউরোপীয় ইংরেজ সভ্যতা জাতিটিকে সামরিক ও বেসামরিক পরিষ্কার দু'টি আলাদা ভাগে ভাগ কোরে ফেলল এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে এই বিভক্তিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিল। একদিকে জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ বে-সামরিক লোকদেরকে একেবারে নখদন্তহীন আমজনতায় পরিণত করার জন্য তাদের অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ করল অন্যদিকে সামরিক বাহিনীকে সমৃদ্ধ কোরতে লাগলো। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে খ্রিস্টানরা তেমন কোনো বিরোধিতার সম্মুখীন হয় নি। তথাপিও শাসনদণ্ডকে নিষ্কন্টক কোরতে খ্রিস্টান শক্তিগুলি তাদের উপনিবেশগুলির সর্বত্র জনগণকে এই সামরিক ও বেসামরিক দু'টি শ্রেণীতে পৃথক কোরে ফেলল।

দাজ্জাল তার অধীন জাতিগুলির মধ্য থেকে বাছাই কোরে নির্দিষ্ট ভর ও উচ্চতার চৌকস কিছু লোককে সামরিক বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত কোরল। তাদের পেছনে বরাদ্দ করা হয় রাষ্ট্রের বাৎসরিক বাজেটের অধিকাংশ অর্থ। তারা দেশের মানুষকে শান্তি ও নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে, আর সাধারণ মানুষের উপরে পড়ে ঐ বাহিনীগুলির ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব। শিক্ষা দীক্ষা, প্রশিক্ষণ, ক্ষমতা, অস্ত্র, উন্নত জীবনযাপন পদ্ধতি ইত্যাদি বহু উপায়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মানসিকতায় একটি শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি সৃষ্টি হয় যেন তারা সাধারণের তুলনায় নিজেদেরকে সর্বদিকে উৎকৃষ্ট (Superior) ভাবতে অভ্যস্ত হোয়ে পড়ে। 'ওদের থেকে আমরা শ্রেষ্ঠ' এই মানসিকতা থেকে আসে অহঙ্কার, অহঙ্কার থেকে আসে বিভক্তি, আর বিভক্তি থেকে আসে অশান্তি। আমাদের আলোচ্য বিষয় এটাই যে এসকল বিভক্তি কি কোরে সৃষ্টি হয়।

সামরিক ও বে-সামরিক বিভক্তিই হোল জাতির মধ্যে সর্ববৃহৎ বিভক্তি। এই দু'টি শ্রেণী একে অপরের উপর নির্ভরশীল হোলেও বাস্তবক্ষেত্রে এদের মধ্যে আসমান ও জমিনের ফারাক সৃষ্টি হোল। এটি কোনো নির্দিষ্ট দেশের অবস্থা নয় বরং সমস্ত দুনিয়া জোড়া সামরিক বাহিনীগুলির এই একই দৃশ্য।

এদের ভিতরেও রাখা হোল বিভিন্ন স্তর, Rank অর্থাৎ বিভক্তি। প্রতিটি স্তরে রোয়েছে সুবিধা, বেতন ইত্যাদির ফারাক। এ নিয়ে উর্ধ্বতনের সঙ্গে অধঃস্তনের মধ্যে প্রায়ই দানা বাঁধে অসন্তোষ। যারা নিুপদের অধিকারী, মাঠকর্মী, তারা প্রায়ই উপরোস্থ অফিসারদের বিরুদ্ধে, তাদের দুর্ব্যবহার, শোষণ, জুলুম এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, অনেক সময় বিদ্রোহের আদলে বহিঃপ্রকাশ ঘটে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের। শুধু তাই নয়, যে সামরিক বাহিনী তৈরি করা হোল বহিঃশত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য তারা এক পর্যায়ে নিজের দেশের অথর্ব দুর্নীতিবাজ সরকারদের সরিয়ে ক্ষমতা দখল করে। ফলে সামরিক বেসামরিক দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। সেই সামরিক অভ্যুত্থান এত ভয়াবহ হৃদয় বিদারক হোয়ে দাঁড়ায় যে, যে ঊর্ধ্বতন অফিসারকে তারা এতকাল স্যালুট কোরে এসেছে, সেই অফিসারকে নির্মমভাবে হত্যা করে। দেশে দেশে এটাই বার বার হোয়ে আসছে। ইহুদি খ্রিস্টান যান্ত্রিক 'সভ্যতা'র ভিত্তি হোচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদ। এটা বাস্তব সত্য যে, মানুষ কেবলমাত্র প্রাণী নয়, শরীর নয়

তার একটি আত্মাও আছে। আল্লাহ যে সনাতন দীন বা দীনুল কাইয়্যেমা আদম (আ:) থেকে শুরু কোরে আখেরী নবী পর্যন্ত সকল নবী রসুলগণের উপর প্রেরণ কোরেছেন তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মানুষের দেহ ও আত্মার ভারসাম্য বিধান করা। দাজ্জাল এই ভারসাম্যকে ধ্বংস কোরে পার্থিব ভোগ বিলাস, অর্থ উপার্জন ও জৈবিক

বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই বে-সামরিক মানুষ সামরিক বিভাগের উপর বীতশ্রদ্ধ

আনন্দ উপভোগকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে মানুষের সামনে নির্ধারণ কোরে দিল। সমগ্র মানবজাতি গোগ্রাসে সেই ভোগবাদী দর্শনকে গিলছে। সবচেয়ে বেশী এই দর্শনে আক্রান্ত হোয়েছে ইউরোপ আমেরিকা, যারা এই দর্শনকে বাকি দুনিয়ার উপরে জোর কোরে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য সামরিক যুদ্ধে লিপ্ত রোয়েছে। মানুষ যে আত্মা ছাড়া বাঁচতে পারে না তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ গণতন্ত্রের পতাকাবাহী যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সদস্যদের আত্মহননের পরিসংখ্যান। সংবাদপত্রের নিয়মিত পাঠকমাত্রই লক্ষ্য কোরে থাকবেন, বিশ্বের সবচেয়ে বেশী আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে মার্কিন সেনাবাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে, বিশেষ কোরে যাদেরকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে ও আফগানিস্তানে গণহত্যা কোরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করা হোয়েছে তাদের

মধ্যে। রয়টার্স প্রকাশিত একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, গত ১০ বছরের প্রতি দিন গড়ে ২২ জন কোরে মার্কিন সৈন্য আত্মহত্যা কোরছেন। এই হিসাবে মাত্র দশ বছরে মার্কিন বাহিনীতে মোট আত্মহত্যার ঘটনা দাঁড়ায় আশি হাজারেরও উপরে। আবার ইসরাইলি সংসদীয় গবেষণা ও তথ্য কেন্দ্র পরিচালিত সাম্প্রতিক এক জরিপ প্রতিবেদনে জানা যায়, ইসরাইলি সেনাবাহিনীতে গত ৬ বছরে ১শ' ২৪ ইসরাইলি সেনা আত্মহত্যা করেছে। তন্মধ্যে ১৩ জন নারী সৈন্য রয়েছে। ফ্রন্ট লাইনে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে ৫৭ জন আত্মহত্যা করে। অধিকৃত পশ্চিম তীর ও পূর্ব তীরে ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে তারা বিবিধ দুশ্চিন্তা ও মর্মবেদনা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। চিন্তা কোরুন কি ভয়াবহ! একথা নিশ্চয়ই স্বীকার কোরবেন যে, পৃথিবীতে সবচেয়ে অগ্রসর, চৌকস ও দক্ষ সেনাবাহিনী ইসরাইল ও আমেরিকার, তাদের প্রতিটি সদস্য ব্যক্তিগতভাবে অকল্পনীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ কোরে থাকেন। বাকী দুনিয়ার সাধারণ মানুষ, সেনাবাহিনীর সদস্যরা এমন কি সরকারগুলি পর্যন্ত মার্কিন বাহিনীর সদস্যদের প্রতি সভয় সম্ভ্রমে চেয়ে থাকে। সম্মানে, যোগ্যতায়, অস্ত্রে-শস্ত্রে, প্রশিক্ষণে এককথায় সর্ববিষয়ে এমন চূড়ায় যাদের আসন, জীবনের প্রতি তাদের এত বিতৃষ্ণা কেন, কেন তারা নিজেদের অমূল্য জীবনকে উপভোগ না কোরে আত্মহননের মাধ্যমে অকালমৃত্যুর পথ বেছে নিচ্ছেন? এর কারণ হোচ্ছে নির্দোষ নারী, পুরুষ, নিষ্পাপ শিশুদেরকে নির্বিচারে হত্যা, অত্যাচার করার পরে নিজের বিবেকের দংশন, আত্মগ্লানী ও অপরাধবোধ তাদেরকে টেনে নিয়ে যায় আত্মহননের পথে। তারা আত্মাহীনভাবে কেবল দেহসর্বস্ব জীব হোয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকেই শ্রেয় জ্ঞান কোরছেন।

এখানেই শেষ নয়, দেশে দেশে সামরিক বাহিনীগুলির মধ্যে নিজস্ব শক্তিমত্তা প্রদর্শনের যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা চোলছে তা কতটা অমানবিক হোতে পারে তার একটি উদাহরণ পেশ কোরছি। বিশ্বের পঞ্চম শক্তিশালী সেনাবাহিনীর অধিকারী উত্তর কোরিয়া। পারমাণবিক শক্তি অর্জনের জন্য তাদের সরকারকে এত বিপুল অর্থ ব্যয় কোরতে হোয়েছে যে সেই দেশে বেশ কয়েক বছর চলমান দুর্ভিক্ষে গত ২ বছরে ১০ হাজার মানুষ না খেয়ে মারা গেছে। যারা বেঁচে আছে তারা কিভাবে বেঁচে আছে? ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত্ত কোরতে উত্তর কোরিয়ার এক লোক তার সন্তান ও নাতিকে জবাই কোরে তাদের মাংস খেয়েছে। এমন ঘটনা সেখানে হয়তো অহরহ ঘোটছে যা

আমারা জানছি না। এই অসুস্থ প্রতিযোগিতা যে কোনো দিন পারমাণবিক যুদ্ধের রূপ নিতে পারে যার পরিণতি হবে মানবজাতির ধ্বংস। পৃথিবীকে ধ্বংস কোরে দেওয়ার

মত ক্ষমতা অর্জন কোরেছে পৃথিবীর অনেক দেশই যারা তাদের এই শক্তিমদে মত্ত হোয়ে প্রতিপক্ষকে প্রতিনিয়ত চোখ রাঙিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই অস্ত্র কেউ প্রয়োগ কোরছে না কারণ তা কোরলে সে নিজেও ধ্বংস হোয়ে যাবে। মানবতা নয়, দয়া নয়, ন্যায়ের প্রতি সম্মান নয়, অন্যায়ের প্রতি বিরূপতা নয়, কত কোটি মানুষ, শিশু পশু নিহত হবে, এ অনুভূতিও নয়– শুধু ভয়, শত্রুকে মারলে আমিও মরব। মানবতা ও ন্যায়ের খাতিরে যে এই হত্যাযজ্ঞ থেকে এরা বিরত নয় তার প্রমাণ নাগাসাকি ও হিরোশিমা। নিজের পরিণামের এই ভয়ই শুধু পৃথিবী ধ্বংসকারী অস্ত্রগুলোকে ব্যবহার থেকে মানুষকে বিরত রেখেছে। যান্ত্রিক 'সভ্য' ভাষায় এরই নাম (Deterent), দা'তাত। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ফোর্ড পরিষ্কার ভাষায় বোলেছিলেন যে দা'তাত (Deterent) কিছু নয়– আমাদের সামরিক শক্তিই হোচ্ছে শান্তির সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি।

আর আত্মহত্যার প্রসঙ্গে এসলামের অবস্থান অতি কঠোর। যেহেতু এসলাম দেহ ও আত্মার নিখুঁত সমন্বয়ে গঠিত একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, তাই আল্লাহ উম্মতে মোহাম্মদীকে 'মিল্লাতান ওয়াসাতা' বা ভারসাম্যপূর্ণ, মধ্যপন্থী জাতি বোলে আখ্যায়িত কোরেছেন (সুরা বাকারা ১৪৩)। এই জাতি যেমন পার্থিব সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, তেমনি আখেরাতেও তার জন্য রোয়েছে উত্তম প্রতিদান। তাই যারা এই মিল্লাতান ওয়াসাতার সদস্য তাদের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা, ক্ষোভ, হতাশা, আত্মিক দৈন্য আসার কোনো সুযোগ নেই, আত্মহত্যারও কারণ নেই। এসলামের ইতিহাসে একটি মাত্র ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায় যেখানে একজন সাহাবী যুদ্ধে মারাত্মক আহত হন। তার আঘাত এতই মারাত্মক ছিল যে তিনি তার যন্ত্রণা সহ্য কোরতে না পেরে মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করার জন্য তার হাতের ধমনী কেটে দেন। যদিও একে সম্পূর্ণরূপে আত্মহত্যা বলা যায় না, তবু রসুলাল্লাহ প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন যে ঐ সাহাবী জাহান্নামী যেন তাঁর উম্মাহ আত্মহত্যার কথা চিন্তাও না করে। এজন্যই এই উম্মাহর মধ্যে এখনও এই শিক্ষা চালু আছে যে, "আত্মহত্যা মহাপাপ"। আত্মহত্যার বিষয়ে আল্লাহর সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রোয়েছে। তিনি বলেন, "তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু। এবং যে কেউ জুলুম করে, অন্যায়ভাবে তা (আঁহত্যা) কোরবে, অবশ্যই আমি তাকে অগ্নিদগ্ধ কোরব, আল্লাহর পক্ষে তা সহজসাধ্য।' (সুরা নেসা, আয়াত : ২৯-৩০)। জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হোয়ে আত্মহত্যার কোনো উদাহরণ এসলামে একটাও বোধ হয় পাওয়া যাবে না। গত ১০ বছরে দাজ্জালের সেনাবাহিনীর ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে মোসলেম দাবিদার যারা বুকে মাইন বেঁধে আত্মঘাতি বোমা হামলা কোরছেন, তাদের মোট সংখ্যাও মার্কিন সেনাবাহিনীর আত্মহত্যাকারী সৈন্যের মোট সংখ্যার চাইতে অনেক কম। এবং এরাও কেউ কেউ আত্মঘাতী হোচ্ছেন হয় জাতির জন্য, নয় দেশের জন্য, নয়তো ধর্মের জন্য অর্থাৎ কোনো না কোনো আদর্শিক কারণে তাদের এই আত্মোৎসর্গ। তবে এসলাম বোমা মেরে নিরপরাধ এবং অসংশ্লিষ্ট মানুষ হত্যা করা, আতঙ্ক সৃষ্টি করাকে অনুমোদন দেয় না।

শেষ কথা হোল, সর্বরকম অশান্তির মূলে হোল অনৈক্য, বিভেদ, বিভক্তি সেটা যে বিষয়েই হোক না কেন। সেটা সামরিক-বেসামরিক বিভক্তি হোক, ভূ-খণ্ডগত বিভক্তি হোক, সামাজিক শ্রেণী বৈষম্যমূলক বিভক্তি হোক এক কথায় মানবজাতির মধ্যে যে

কোনো ক্ষেত্রেই হোক যত Division সৃষ্টি করা হবে, যত শ্রেণীবিভেদ করা হবে, তত অন্যায়, জুলুম এবং অবিচার অর্থাৎ অশান্তি বৃদ্ধি পাবে। আর দাজ্জাল অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা' এই কাজটিই কোরেছে। সে মানবজাতিকে শাসন ও শোষণের সুবিধার জন্য তার প্রযুক্ত সিস্টেম বা জীবনব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষকে হাজারো লক্ষভাগে বিভক্ত কোরে অন্যায়, অবিচার, রক্তপাত, অশান্তির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোরে রেখেছে। শুধু আত্মহত্যা নয়, যাবতীয় অসন্তোষ, ন্যায় আর অবিচারের মূলে যে আত্মাহীন, জড়বাদী, বস্তুবাদী দাজ্জালীয় 'সভ্যতা', আজ সময় এসেছে সেই নারকীয় 'সভ্যতা' থেকে বেরিয়ে স্রষ্টার দেওয়া অনাবিল শান্তিময়, ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা বা সিস্টেমে প্রবেশ করার।

গরিব রোগীরা হাসপাতালগুলিতে সিট না পেয়ে সিঁড়িতে, মেঝেতে পড়ে থাকেন।

ধনী নির্ধনের পৃথক হাসপাতাল

ভাগ সৃষ্টি করা হোল চিকিৎসা ক্ষেত্রেও। একটা করা হোল জেনারেল হাসপাতাল, সরকারী। খরচ কম হওয়ায় গরিব রোগীরা এখানে যান। গুরুতর রোগীরা সিট না পেয়ে এখানে সিঁড়িতে, মেঝেতে পড়ে থাকেন, কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত অব্যবস্থাপনায় তাদের দুর্ভোগ সীমা ছাড়িয়ে যায়। সাধারণ মানষ উপায়ন্তর না দেখে বিনা চিকিৎসায় স্বজনের আমানবিক মৃত্যু দেখে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটান হাসপাতালে হামলা কোরে ভাংচুর করে, ডাক্তারদের মারধোর করে। অন্যদিকে সামরিক বাহিনীর জন্য আলাদা হাসপাতাল, ধনীদের জন্য স্পেশালাইজড হাসপাতাল এমনি বিভিন্ন ভাগ। এখন যার যতো টাকা আছে সে তত বড় হাসপাতালে যেয়ে চিকিৎসা করে আর যার টাকা নাই সে বিনা চিকিৎসায় বা অপচিকিৎসায় মারা যায়। অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভেদ, বৈষম্য।

সরকার পোষণে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়

আজকের আমেরিকায়, ইউরোপে অর্থনৈতিক পতনের হাত থেকে বাঁচার জন্য বলা হোচ্ছে, ব্যয় সংকোচন করো। কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যয়ের খাত সৃষ্টি কোরে তা অব্যাহত রেখে সাধারণ মানুষকে ব্যয় সংকোচন কোরতে বলার কোনো যৌক্তিকতা নেই। সেই বড় ব্যয়ের খাত হোচ্ছে সরকার নিজেই। প্রতিটি দেশের মানুষের প্রদত্ত করে (Tax) এবং ব্যয়ে সরকার, সরকারী সংগঠন ও বাহিনীগুলি পরিচালিত হয়। যতগুলি দেশ পৃথিবীতে আছে ততগুলি সরকারও আছে, সুতরাং সেই সরকারগুলির ব্যয় আলাদা আলাদাভাবে সেই দেশের মানুষকে বহন কোরতে হোচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ, ভারত উপমহাদেশে ছয়টি দেশ ছয়টি সরকারের ব্যয় বহন করে। যদি ছয়টি দেশ মিলে একটি দেশ হোত, সরকার থাকতো একটি। আজ দেশগুলিতে পৃথক সরকার থাকায় যে ব্যয় কোরতে হোচ্ছে, একটি সরকার থাকলে কি সেই পরিমাণ ব্যয় হোত? কখনওই না। অন্তত ৭০-৮০% ব্যয় 'সংকোচিত' হোত। ভৌগোলিক বিভক্তির মাধ্যমে অকল্পনীয় পরিমাণ অর্থ প্রতিদিন অপচয় করা হোচ্ছে। এই অপচয়ের কারণেই সারা পৃথিবীর শোষণকারী পাশ্চাত্য দেশগুলিও আজ আর্থিক দৈন্যের শিকার।

পক্ষান্তরে এসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় (ভৌগোলিক রাষ্ট্র নয়) রাষ্ট্র প্রধান অর্থাৎ এমাম রাষ্ট্র থেকে ভাতা পাবেন একজন সাধারণ মানুষের প্রয়োজন মোতাবেক; অর্থাৎ জীবনের মৌলিক প্রয়োজন, খাবার, কাপড়, বাসস্থান ইত্যাদি। কোনো বিলাসিতা, আড়ম্বর, কোনো জাঁক-জমকের জন্য রাষ্ট্র খরচ বহন কোরবেন না। প্রকৃত এসলামের যুগে খলিফারা এর বেশী পান নি। মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে বাসস্থানটাও তারা পান নি। কারণ খলিফা হবার আগে তাদের নিজেদের যে বাড়ী ছিলো তারা তাতেই থাকতেন এবং তা প্রায় কুঁড়েঘরের পর্যায়ের ব্যাপারে ছিলো। তারপর উম্মতে মোহম্মদী যখন তাদের নেতার (দ:) আরদ্ধ কাজ কোরতে কোরতে আটলান্টিকের সমুদ্রতট থেকে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত এই জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কোরল তখন পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হোয়ে দাঁড়ালো এই উম্মাহ, তখনকার দিনের বিশ্বশক্তি (Super Power)। কিন্তু খলিফাদের ভাতা ঐ-ই রোইলো। আলী (রা:) পর্যন্ত এই মহাশক্তির নেতারা তালি দেওয়া কাপড় পোরে, অর্ধাহারে থেকে, কুঁড়ে ঘরে বাস কোরে এই মহাশক্তির নেতৃত্ব কোরে গেছেন। কিন্তু ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির দাসত্বের পর আবার যখন মোসলেম দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলি তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফিরে পেলো তখন এই জাতির নেতৃত্ব বাঁদরের মত প্রভুদের সব কিছু অনুকরণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নেতাদের অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, আইন সভার সদস্যদের মত মহা জাঁকজমক, চাকচিক্য ও বিলাসিতাও অনুকরণ কোরতে লাগলো। শুধুমাত্র তাদের পাহারা দেওয়ার জন্য অকল্পনীয় অর্থ ব্যয় হয় একটা গরিব দেশের মানুষ চিন্তাও কোরতে পারবে না, অথচ মোসলেম জাতিসত্তার স্রষ্টা মোহাম্মদ (দ:) সহ পরের চার খলিফাদের কারুরই দেহরক্ষী ছিলো না বরং ইতিহাসে পাই গাছের নিচে খেজুর পাতার মসজিদে দিন যাপন কোরেছেন, খলিফা ওমর (রা:) মদীনা থেকে যেরুজালেম পর্যন্ত প্রায় ১৩০০ কিলোমিটার পথ ভ্রমণ কোরেছেন কেবলমাত্র একজন ভৃত্তকে সঙ্গে নিয়ে। সামাজিক নিরাপত্তার এমন উদাহরণ আজকের দুনিয়ায় অকল্পনীয়।

পশ্চিমা প্রভুদের অন্ধ অনুকরণের প্রাণান্তকর প্রয়াসে নামকাওয়াস্তে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মোসলেম দেশগুলির নেতারা এটুকু ও বুঝলেন না যে যাদের অনুকরণ কোরতে চেষ্টা কোরছেন তারা বিরাট ধনী, তারা পৃথিবীটাকে কয়েক শতাব্দী ধোরে শোষণ কোরে সম্পদের পাহাড়ে বোসে আছে, তারা মহা শক্তিমান, তাদের ঐ আড়ম্বর, জাঁকজমক,

বিলাসিতা, সাজে, এদের সাজে না, হাস্যকর। এরা অভুক্ত, অর্ধভুক্ত, আধমরা জাতিগুলির নেতা।

না বুঝলেও তারা ক্ষান্ত হোলেন না। পূর্ব প্রভূদের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীরা যেমন সুসজ্জিত প্রাসাদে বাস করেন এরাও তাই কোরতে লাগলেন। তাদের আইন পরিষদের সদস্যরা যে মানের জীবন-যাপন করে তাই কোরতে লাগলেন। পাশ্চাত্য দেশগুলির জনসাধারণ এই শোষিত জনগণের চেয়ে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বহু উপরে।

তৃতীয় বিশ্বের সরকার ও সাধারণ মানুষের তুলনামূলক অবস্থান

তাদের পক্ষে তাদের সরকারের ঐ জাঁকজমক জোগান দেয়া কঠিন ছিল নয় (এখন অবশ্য অনেকটাই কঠিন হোয়ে দাঁড়িয়েছে, ব্যয় কমানোর জন্য খোদ বৃটিশ রাজপরিবারের বিরুদ্ধেও মানুষ কথা বোলছে)। কিন্তু প্রাচ্যের গরিব জনসাধারণ, যাদের পরনের কাপড় নেই, পেটে খাবার নেই, তাদের পক্ষে তা অসম্ভব। কিন্তু ঐ অসম্ভবকেই তাদের সম্ভব কোরতে হোচ্ছে আরও না খেয়ে থেকে, আরও উলঙ্গ থেকে। আগে না খেয়ে টাকা যোগাত বিদেশী প্রভুদের, এখন আরও না খেতে থেকে কর দেয় নিজেদের নির্বাচিত সরকারকে। বিদেশী প্রভুদের যত কর দিতো, আজ নিজেদের নেতাদের জাঁকজমক, আড়ম্বর বজায় রাখতে তার চেয়ে অনেক বেশী কর দেয়। দেশী নেতাদের পাশ্চাত্যের ঠাট নকল করাও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সেই সঙ্গে গরিব

জনসাধারণের উপর করের বোঝাও বাড়ছে। হীনমন্যতায় অন্ধ প্রাচ্যের এই জাতিগুলির নেতৃত্ব এ কথা বুঝতে অসমর্থ যে নিজস্ব সত্বা বিসর্জন দিয়ে অন্যের অন্ধ অনুকরণ যারা কোরতে চায় তাদের এটাও হয় না, ওটাও হয় না, তাদের একূল-ওকূল দু'কুলই যায়। কাকের জন্য ময়ূরের পুচ্ছধারণ মানায় না, একটা সময় সেই ছদ্মবেশ প্রকাশিত হোয়ে যায়। তাই তাদের সবই গেছে। পাশ্চাত্যের মত অর্থনৈতিক উন্নতি, তাদের ভাষায় "জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন" ঘটে নি, মাঝখান থেকে বিরাট ঋণে পাশ্চাত্যের কাছে বাধা পড়ে গেছে প্রায় প্রত্যেকটি জাতি, দেশ। এটাই Divide and Rule নীতির করুণ বাস্তবতা।

শ্রমিক ও মালিক বিরোধ

পুঁজিবাদীদের ঋণের জালে বন্দী তৃতীয় বিশ্বের সরকার ও মানুষ

শ্রমিকদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত কোরে জোর কোরে তাদের থেকে শ্রম আদায় করার ইতিহাস মানব সভ্যতায় বহুল আলোচিত। এই নির্যাতিত শ্রমজীবি মানুষগুলি তখনই মুক্তি পেয়েছে যখন আল্লাহর কোনো নবী-রসুলের দ্বারা ঐ সমাজে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা কায়েম হোয়েছে। অতীতকালে এই শ্রমিকদেরকে বলা হোত দাস, গোলাম। এখন দাসের বদলে শ্রমিক, কর্মী এবং এমন আরও সুন্দর সুন্দর সুশীল শব্দ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সুন্দর শব্দের অন্তরালে এখনও সেই ক্রীতদাসের নিপীড়িত অভিব্যক্তিই দেখা যায়। এমনকি বর্তমানের অবস্থা আরও ভয়াবহ, কারণ দাসপ্রথায় মনিব ক্রীতদাসের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ কোরত আর আজ নাম মাত্র মজুরিতে শ্রমিক ভাড়া কোরে তার শ্রম ক্রয় করা হয়, কিন্তু আর কোনো দায় দায়িত্বই নেওয়া হয় না। শ্রমিকদের ব্যাপারে রসুলাল্লাহর হুকুম হোচ্ছে, শ্রমিকের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই তার মজুরি দিয়ে দাও। এটা রসুলাল্লাহর কেবল উপদেশবাণী নয়, এটা ছিল উম্মাহর প্রতি তাঁর হুকুম, নির্দেশ যা উম্মাহ কিভাবে বাস্তবায়ন কোরেছে তা ইতিহাস। রসুলাল্লাহ বোলেছেন,

‘তোমাদের গোলাম তোমাদের ভাই। তারা বাধ্য হোয়ে তোমাদের অধীন হোয়েছে। তাই যার ভাই তার নিজের অধীন তার উচিৎ, সে নিজে যা খায় তা-ই তাকে খেতে দেয়, নিজে যা পরে তা-ই তাকে পোরতে দেয় এবং সাধ্যের বাইরে তার কাছ থেকে কোনো কাজ আদায় না করে।’ প্রত্যেক মোসলেম তাই তার অধীনস্থ ব্যক্তিকে তাকে নিজের ভাই জ্ঞান কোরতেন। ওমর (রা:) নিজে যেরুযালেম যাওয়ার সময় অর্ধেক পথ নিজে উটে আরোহণ কোরেছেন, বাকি অর্ধেক পথ নিজের দাসকে উটে আরোহণ কোরিয়ে নিজে উটের রশি টেনে নিয়ে গেছেন। সত্যদীন প্রতিষ্ঠিত থাকার ফলে খলিফার সঙ্গে কোনো দেহরক্ষী বাহিনীরও প্রয়োজন পড়ে নি। এমন একটি অবস্থা কি আজ কল্পনা করা যায়? সেই সমাজ দিতে পারে কেবলমাত্র আল্লাহর সত্যদীন।

সত্যদীন পৃথিবীর যে অংশে প্রতিষ্ঠিত হবে, সেখানে কেবল মানুষই তার অধিকার পাবে তাই নয়, সেখানে প্রতিটি প্রাণীর অধিকার নিশ্চিত হবে। আল্লাহর রসুল বোলেছেন, ‘হে মানুষ! বাকহীন পশুর সাথেও রহম করো। যখন তোমরা এদেরকে সফরে নিয়ে যাও তখন তাদের উপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দিও না। তাদের সাথে ইনসাফ করো এবং ইনসাফ করার অর্থ হোচ্ছে, যে পরিমাণ বোঝা তারা বহন কোরতে পারে তার চেয়ে বেশি চাপিয়ে তাদেরকে কষ্ট দিও না।’ যেখানে পশুদেরকে দিয়েও সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ আদায় করা নিষেধ সেখানে মানুষকে দিয়ে তা করানোর তো প্রশ্নই আসে না। অথচ আমরা দেখি শিল্প কারখানাগুলিতে অতি অল্প বেতনে শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হয়। শ্রমিকরা যেন চাকুরী কোরতে বাধ্য থাকে সেজন্য তাদের মাসের পর মাস বেতন ও ওভারটাইমের টাকা বকেয়া রেখে দেয়। ঘাম তো বহু আগেই শুকিয়ে গেছে, এবার না খেয়ে রক্ত মাংস শুকিয়ে হাড্ডিসার হোয়ে যায়।

বিশ্বের শাসকদের আসনে ইহুদি খ্রিস্টান ‘সভ্যতা’-রূপী যে দানব দাজ্জাল বসে আছে সে চায় অধিকাংশ মানুষ যেন নিজেদের জীবনধারণের জন্য সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রোজগার কোরতে বাধ্য হয়। দু’মুঠো অন্ন, মাথা গোঁজার ঠাঁই আর কিছু মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য যদি তাকে উদয়াস্ত রক্ত পানি কোরে পরিশ্রম কোরতে হয়, এর পেছনে মানুষের সমস্ত সময়, শ্রম, মেধা, যোগ্যতা খরচ কোরে ব্যস্ত থাকতে হয় তাহোলে সে তার এই দাসত্বের জীবন থেকে মুক্তির চিন্তাও কোরতে পারবে না, কোনদিনই ঐ শোষকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হোতে পারবে না। ওসব চিন্তা কোরতে

গেলেই তাকে না খেয়ে খোলা আকাশের নিচে থাকতে হবে। এইভাবে দাজ্জাল পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকে পাকস্থলী কেন্দ্রীক কোরে ফেলেছে। এতে কোরে তার কর্তৃত্ব ও শাসন বিরাট ঝুঁকি থেকে মুক্ত হোয়ে গেছে। সে যে ব্যবস্থা (System) কোরে রেখেছে এতে একদিকে কিছু পুঁজিপতি মানুষের বিরাট সম্পদের পাহাড় জমে উঠবে, সেই পাহাড়ে বোসে তারা অকল্পনীয় ভোগ বিলাসে মত্ত থাকবে, অপরদিকে সেই গুটিকয় মানুষের ভোগ বিলাসের অর্থ যোগান দিতে গিয়ে কোটি কোটি বনী আদম তাদের ন্যূনতম অধিকার থেকেও বঞ্চিত হোয়ে প্রায় পশু পর্যায়ের জীবন যাপন কোরতে বাধ্য হবে।

পাশাপাশি দাজ্জাল শ্রমিকদের বোলছে ইউনিয়ন করো, আন্দোলন করো, অপরদিকে মালিককে বোলছে দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করো। মালিকরা যদি শ্রমিক ইউনিয়নের চাপ, অসহোযোগ আন্দোলন, লক-আউট ইত্যাদির কারণে তাদের কিছু দাবি দাওয়া মেনে নেয় বা মজুরি বৃদ্ধি করে ওদিকে দাজ্জালের অনুগত সরকারগুলি তাদের যাতায়াতভাড়া, গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে দেয় এবং ব্যবসায়ীরা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে দেয়। ফলে শ্রমিকের মজুরি দু' টাকা বাড়লে ব্যয় বাড়ে দশ টাকা। এভাবেই আবর্তিত হয় শোষণের চক্র।

শ্রমিকদের বঞ্চিত কোরে মালিকরাও যে খুব সুখে আছে তেমন কিন্তু নয়। এটা সত্য যে তারা তাদের পরিবার নিয়ে সীমাহীন ভোগবিলাসে জীবনযাপন করেন। কিন্তু সুখ, শান্তি (Peace and happiness) আর ভোগবিলাস, আরাম আয়েশ (Comfort and enjoyment) কখনও এক জিনিস নয়। সুখ হোচ্ছে মানুষের দুঃশ্চিন্তাহীন, আতঙ্কহীন, হতাশাহীন একটি অবস্থা। মালিকপক্ষের যে কাউকে জিজ্ঞেস কোরে দেখুন তারাও শ্রমিকদের চেয়ে খুব একটা সুখে নেই। কারণ ব্যাংকের ঋণ, চাঁদাবাজি, আমদানী-রফতানীর সীমাহীন জটিলতা, সরকারী কর্মকর্তাদেরকে প্রতিনিয়ত ঘুষ দিয়ে খুশি রাখা, শ্রমিক বিক্ষোভ, বাজারদরের অনিয়ন্ত্রিত উত্থান-পতন বহুকিছু নিয়ে তারা মারাত্মক অসুখী জীবনযাপন করেন। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, বর্তমানের সিস্টেমগুলি কাউকেই সুখী কোরতে পারছে না, মালিককেও না, শ্রমিককেও না।

দাজ্জাল সুপরিকল্পিতভাবে মালিক ও শ্রমিককে একে অপরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়েছে। একদল ইউনিয়ন কোরে ন্যায্য পাওনা আদায়ের জন্য চাই চাই কোরে মিছিল করে,

ভাঙচুর করে, হরতাল করে। এর নিরসনে সরকার পুলিস লাগিয়ে বুভুক্ষু হাড্ডিসার দুর্বল মানুষগুলিকে রাজপথে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে, পদদলিত করে। এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সভা সেমিনার গরম করে মানবাধিকার নামক কিছু আঁতেলমার্কা সংগঠন, এগুলির স্রষ্টাও ঐ দাজ্জাল অর্থাৎ পশ্চিমা প্রভুরা। কারণ ওরা জানে তারা যে সিস্টেম

মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বিক্ষোভ প্রায়শই সহিংসতায় রূপ নেয়। কারখানায় আগুন, সংঘর্ষও প্রায় সব দেশেই নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা।

চালু কোরতে যাচ্ছে তাতে এক পর্যায়ে মানবজাতির দেহে সৃষ্টি হবে বিরাট বিরাট ক্ষত যা ঢেকে রাখার জন্য অর্থাৎ আই ওয়াশ কোরতে দরকার পড়বে কিছু ব্যান্ডেজ। মানবাধিকার সংস্থার নামে সেই ব্যান্ডেজও তৈরী কোরল তারা। ব্যান্ডেজ লাগালে ক্ষত ভালো হয় না, এর জন্য অন্য চিকিৎসা দরকার। এখন একেক জন তাদের অধিকার চায়, অধিকারের জন্য জ্বালাও পোড়াও করে। সবাইতো অধিকার হারিয়েছে, সবার অবস্থানে সবাই বঞ্চিত, অবিচারের শিকার। অদ্ভুত লাগে যে, হরতাল করে গাড়ী জ্বালাও-পোড়াও করা গণতান্ত্রিক অধিকার, আবার হরতালকারীদেরকে পিটিয়ে হাড়গোড় ভেঙ্গে দেয়াও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, সংসদে যেয়ে ঝগড়া, মারামারি, বিতর্ক করা গণতান্ত্রিক অধিকার আবার সংসদে যোগ না দেয়াও নাকি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। প্রকৃত

সত্য হোল, শুধু শ্রমিক নয়, যে কোনো অধিকার আদায়ের জন্য বিক্ষোভ, দাঙ্গা, হরতাল ইত্যাদি কোরে কস্মিনকালেও কোনো লাভ হবে না। কার কাছে আপনারা অধিকার চাইবেন? বিশ্বপ্রতারক ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা' দাজ্জালের অনুসারীদের কাছে? দাজ্জাল তো আবির্ভূতই হোয়েছে মানুষের অধিকারকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য। এবং বহু আগেই সে পৃথিবীর সকল শ্রেণীর মানুষের অধিকার হরণ কোরে নিয়েছে এবং তাদেরকে মোহনীয় মতবাদের জালে আটকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। তার কাছে অধিকার আশা করা অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছু নয়।

পদবি বিতরণ করে বিভাজনের সৃষ্টি

চতুর ব্রিটিশরা সাধারণ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন কোরে তাদের একান্ত অনুগত কিছু ব্যক্তিকে বিভিন্ন পদবীতে ভূষিত কোরে তাদেরকে অভিজাত আখ্যা দিয়ে (যেমন রায়বাহাদুর, খানবাহাদুর, রাজা, নওয়াব ইত্যাদি) সাধারণ জনগণ থেকে আলাদা কোরল। আজও তাদের বংশধরেরা উক্ত পদবী নামের আগে বা পরে ব্যবহার কোরে অহংকার, অহমিকা স্ফীত হোয়ে সাধারণ মানুষ থেকে নিজেদের আলাদা ভাবেন এবং আচরণও ঐ রকম করেন।

প্রশাসনিক বিভক্তি

দাজ্জাল যেভাবে গোটা পৃথিবীকে পদানত কোরে যত প্রকারে বিভক্ত করা যায় কোরেছে, তার মধ্যে প্রশাসনিক বিভক্তি অন্যতম। প্রকৃত এসলামে প্রশাসনিক ব্যবস্থা দাজ্জালের বর্তমান সিস্টেমের মত ছিল না। আল্লাহর রসুল যখন মদীনার শাসনকর্তা হোলেন তখন মসজিদে নববী ছিল ঐ সদ্যপ্রসূত রাষ্ট্রের প্রধান কার্যালয়। মসজিদে নববীতে যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সালাহ কায়েম হোত তেমনি বিচার ফায়সালা, দণ্ডবিধি প্রয়োগ সবই হোত, এমনকি বিদেশি রাষ্ট্রের দূতগণ এখানে এসে মহানবীর সাথে সাক্ষাৎ কোরতেন। এক কথায় জাতির সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মসজিদ। প্রতি শুক্রবারে মো'মেন, মোসলেম মসজিদে নববীতে জমায়েত হোতেন, জাতিকে দিকনির্দেশনামূলক প্রদত্ত মহানবীর ভাষণ শুনতেন, জুম'আর পর আল্লাহর বিধান মোতাবেক প্রকাশ্যে বিচার ফয়সালা ও রায় বাস্তবায়ন হোত। এতে শুধুমাত্র মোসলেম নয় অন্যান্য জাতির লোকেরাও উপস্থিত থাকতো।

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কায়েম আছে এমন এলাকাগুলিতে যেখানে মহানবী নিজে যেতে পারতেন না সেখানেও অনুরূপ মসজিদ নির্মাণ কোরে ঐ মসজিদকে কেন্দ্র কোরে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে আমির নিয়োগ কোরে দিতেন। ঐ আমির উক্ত দূরবর্তী অঞ্চলে মহানবীর পক্ষে খোতবা দিতেন, বিচার ফায়সালা কোরতেন, মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান কোরতেন। দশম হেজরীতে মু'আয ইবনে জাবাল (রা:) কে ইয়ামান ও হাদারামাওত এর গভর্নর নিয়োগের পর তাঁকে বিদায় দেয়ার মুহূর্তে রসুলাল্লাহ বলেন, "হে মু'আয! তুমি আহলে কেতাবের একটি সম্প্রদায়ের নিকট গমন কোরছ। তারা তোমাদেরকে জান্নাতের চাবি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কোরবে। তুমি তাদের জানিয়ে দিবে যে, জান্নাতের চাবি হোল 'লা এলাহ এল্লাল্লাহ।' এই চাবি (আল্লাহর নিকট পৌঁছার) প্রত্যেক যবনিকা ভেদ কোরে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। যে ব্যাক্তি কেয়ামতের দিন এই চাবিসমেত কোনো ধরনের পাপ নিয়ে হাজির হবে, তার ও আল্লাহর মধ্যখানে কোনো আড়াল থাকবে না।" মু'আয (রা:) বোললেন, "আপনার কি অভিমত, যে বিষয়গুলি কোর'আনে নাই এবং আপনার নিকট হোতেও শুনতে পাই নাই, সেগুলি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলে আমি কি তাদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হব?" রসুলাল্লাহ বোললেন, "বিনম্র হও, তাহোলে আল্লাহ তোমাকে সমুন্নত রাখবেন। কোনো বিষয়ে জানা না থাকলে কখনো কোনো ফায়সালা দিবে না। কোনো বিষয়ে জটিলতা দেখা দিলে জনগণের নিকট সে বিষয় জানতে চাইবে। সংকোচ বোধ কোর না, পরামর্শ নিও। এর পর নিজে চিন্তা ভাবনা কোরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কোর। যদি আল্লাহ তোমার মধ্যে সত্যনিষ্ঠা দেখতে পান তবে তিনি তোমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তওফিক দান কোরবেন। যদি কোনো বিষয়ে তোমার সন্দেহ হয় তা হোলে অপেক্ষা কোরবে যতক্ষণ না তুমি নিশ্চিত হবে কিংবা সেই বিষয়ে জানতে চেয়ে আমার নিকট চিঠি লিখবে। প্রবৃত্তির লালসা পূরণ হোতে বিরত থাকবে। কেননা সেটাই দুর্ভাগাদিগকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। তদুপরি তোমার উচিত সদাশয় ও বিনম্র হওয়া।"

খোলাফায়ে রাশেদার সময়ও একই ভাবে এসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাবলী পরিচালিত হোত। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে, মানুষ শুধুমাত্র দেহ সর্বস্ব একটা বস্তু নয় এর একটা আত্মাও আছে আর সেটা হোল আল্লাহর রুহ (সূরা হেজর ২৯) কাজেই মানুষ দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে একটা ভারসাম্যপূর্ণ প্রাণী যাদের আল্লাহ তার

খলিফা বা প্রতিনিধি হিসাবে আখ্যায়িত কোরেছেন (বাকারা- ৩০)। এই খলিফার কাজ হোল এই পৃথিবীতে তার প্রভুর দেওয়া জীবন ব্যবস্থা দিয়ে পৃথিবী পরিচালনা করা তবেই তারা সুখে, শান্তিতে, সমৃদ্ধিতে বসবাস কোরতে পারবে। এই জন্য আল্লাহ যে শেষ জীবনব্যবস্থা পাঠালেন এটাও শরীয়াহ ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে একটা ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা। কাজেই মানুষ একদিকে মসজিদে উপস্থিত হোয়ে তার রব, প্রভু, মালেক, এলাহের সামনে সেজদাহবনত হবে আর অন্যদিকে তাঁর দেওয়া জীবন ব্যবস্থা দিয়ে তাদের ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্র পরিচালনা কোরবে। এই জন্য এই জাতির মসজিদগুলো শুধু সালাতের স্থান বা উপাসনালয় ছিল না, এটা ছিল যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদীর কয়েক শ বছর পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু ছিল অর্ধেক পৃথিবীতে, এমন কি ঔপনিবেশিকদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত বিকৃতভাবে হোলেও স্থানীয় সরকার প্রশাসনে মসজিদ ছিল একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান।

নির্বাচনপরবর্তী দাঙ্গা, বিজয়ী দলের উপর হামলা ও অগ্নিসংযোগের এই দৃশ্য কেবল আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর আরও বহু দেশেই দেখা যায়। এটি কেনিয়ার দৃশ্য।

এমন কি শিক্ষাব্যবস্থাও ছিল মসজিদকেন্দ্রীক। দাজ্জাল এসে জাতীয় জীবনের সঙ্গে ধর্মের সবগুলি যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন কোরে দিলো। সবচেয়ে বড় একটি যোগসূত্র ছিল এই মসজিদ ভিত্তিক প্রশাসন। দাজ্জাল এসে চালু কোরল পৃথক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, ইংল্যান্ডের আদলে অর্থাৎ নিজেদের দেশের আদলে। এই প্রশাসন পরিচালনার জন্য ভাইসরয় থেকে ম্যাজিস্ট্রেট, জজ, অনেক ক্ষেত্রে দারোগা পর্যন্ত নিয়োগ দেওয়া হোল তাদের দেশ থেকে এনে। স্থানীয় লোকদের থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোল যা এখনও চালু আছে। এখন সকল রাষ্ট্রই প্রায় জেলা, গ্রাম, ইউনিয়ন ইত্যাদি পর্যায়ে বিভক্ত, যদিও একেক দেশে একেক নামে। প্রতিটি গ্রাম বিভক্ত, প্রতিটি স্কুল বিভক্ত। কোনো দেশের গ্রামে পাঞ্চায়েত, সমিতি, গ্রাম প্রধান, কোনো দেশে কাউন্সিলর, কোনো দেশের গ্রামে চেয়ারম্যান, মেম্বার পদ দিয়ে স্থায়ী মারামারি, সংঘাত, স্থায়ী অশান্তির ব্যবস্থা করা হলো। একবার একজন জয়ী হলে তার বিরুদ্ধে বাকী দশজন মিথ্যা, ষড়যন্ত্র, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়। স্থানীয় প্রভাব খাটিয়ে দলে লোক টানে। ব্যবস্থাটি এমন যে, জাতি দূরের কথা একটা গ্রামের লোকও কোনো বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হবে না। আমাদের দেশেও গ্রামেগঞ্জে, পাড়ায় মহল্লায় এমন সব দোকান ও ক্লাব গড়ে উঠেছে যার অধিকাংশই অশ্লীল বাক্য, সমালোচনা এবং ষড়যন্ত্রের আখড়া। বলা যায় স্থানীয় 'সংসদ'।

আর মসজিদকে করা হোল কেবলই উপাসনালয়, নামাজ আর যেকেরের স্থান। সেখানে দুনিয়াবী কর্মকাণ্ড এমন কি কথাবার্তাও হারাম বোলে প্রচার করা হোল। একদা কর্মচঞ্চল মসজিদগুলি নামাজ পড়ার কয়েক মিনিট সময়টুকু বাদে সমস্তক্ষণ মৃত্যুপুরীর নিস্তব্ধতা নিয়ে তালাবদ্ধ পড়ে থাকে। যে এমাম জুম'আর দিনে হাজির হোলে অপরাধীদের আত্মায় কাঁপুনি ধোরত, যে এমাম ছিলেন মোসলেম সমাজের শাসনকর্তা, যার হুকুমে দণ্ডবিধি কার্যকরী হোত, সেই এমাম এখন কয়েকশ টাকার কর্মচারী মাত্র যে কিনা সারাক্ষণ মসজিদ কমিটির ভয়ে তটস্থ থাকে– কখন যেন চাকরিটা চোলে যায়। এভাবে ধর্মকে মানবজীবনের কার্যকরী অঙ্গন থেকে নির্বাসিত করার সুদূরপ্রসারী ফল যে কত ভয়ঙ্কর তা আল্লাহর লা'নতের বস্তু ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা'র গোলাম এই জাতিটি বুঝতে সক্ষম হোল না। দাসত্ব তাদের রক্তে মজ্জায় মিশে যাওয়ায় তারা চিন্তা ও চেতনাতেও দাসে পরিণত হোয়েছে। স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতাও তারা হারিয়ে ফেলেছে।

রাষ্ট্রসংঘ শোষণের আধুনিক পদ্ধতি

আজ মানবসমাজের সকল স্তরে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত অন্যায়, অত্যাচার, অশান্তি, অবিচার, যুলুম, রক্তপাত, খুন, যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছে। এ অবস্থা সৃষ্টির অন্যতম কারণ Divide and Rule নীতি, মানুষকে ঐক্যহীন কোরে তাকে পদানত করার শোষণমূলক নীতি। এই নীতি কায়েম কোরে আজ দাজ্জাল আবার জাতিসংঘ, সার্ক, ওআইসি, ওপেক, ন্যাটো, কমনওয়েলথ ইত্যাদি বহু আন্তর্জাতিক সংগঠন কোরে গুচ্ছাকারে সকলের উপরে ছড়ি ঘোরাচ্ছে। তারাই ভৌগোলিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম কোরছে, তারাই এসব বহুজাতিক সংগঠনের মাধ্যমে তাদের সামনে উন্নয়নের মুলো ঝুলিয়ে প্রতারণা করছে, নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করছে, তারাই আবার মানুষের কাছে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সূত্র মুক্তবাজার অর্থনীতি, এক বিশ্বব্যবস্থা, বিশ্বায়ন প্রভৃতি মতবাদ ফেরি করছে। অথচ এক বিশ্বের ধারণা দেয় যে এসলাম তাকে অবাঞ্ছিত কোরে রাখা হোয়েছে। আল্লাহ বলেন, সমগ্র মানবজাতি এক পরিবারভুক্ত, তারা সবাই বনী আদম। তাদের ঐক্যতেই শান্তি। ঐক্যবদ্ধ করার এই প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় এক পুরুষ ও এক নারীর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে। এই বন্ধনকেই বলা হয় আকদ্। দুই জন মানুষকে একটি বন্ধনে আবদ্ধ কোরে শুরু হোল ঐক্যবদ্ধকরণ প্রক্রিয়া, পর্যায়ক্রমে পরিবার, সমাজ এবং বিশ্ব। এটাই বনী আদমের বৃহৎ পরিবার। এই মানবজাতির নেতা বা এমাম থাকবেন একজন। একটা জীবন-ব্যবস্থা থাকবে তাদের, সেটা আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থা। একক মুদ্রা থাকবে যা পৃথিবীর সর্বত্র চলবে, কোথাও এই মুদ্রার মানের পরিবর্তন হবে না। এখন দেখা যায়, আমাদের দেশের একশ টাকা অন্য স্থানে গেলে এক টাকা। আমাদের দেশের একশত লোকের বেতন মধ্যপ্রাচ্যের বা যুক্তরাষ্ট্রের একজনের সমান। এই জুলুমের অবসান না হলে কখনও শান্তি আসবে না। আবার গত ১০০ বছরে সারা দুনিয়ায় যে রক্ত ঝোরল শুধু স্বাধীনতার জন্য, মুক্তির জন্য এত রক্ত বিগত হাজার বছরেও ঝরে নি। যে শান্তিময় ভবিষ্যতের স্বপ্নকে বুকে নিয়ে মানুষ এত রক্ত দিল, সেই শান্তি কি মিলেছে? মেলে নি এবং মিলবে না।

এই গোলকধাঁধা থেকে মুক্তির পথ আল্লাহ পাঠিয়েছেন। সেই পথ হোচ্ছে এ সমস্ত ভাগ, বিভাগ মুছে দিয়ে আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থার অধীনে সমস্ত মানবজাতিকে নিয়ে আসতে হবে। আল্লাহর কাছে মানুষের সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি হোচ্ছে তার

তাকওয়া অর্থাৎ যে তার জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মনে রেখে পথ চলে সেই আল্লাহর কাছে বেশী সম্মানিত। এসলামের মধ্যেও তার সম্মান ও মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। সমাজে, সরকারের সবচেয়ে উঁচু পর্যায়ের কর্মকর্তা তিনি হবেন যিনি তাকওয়ায়, জনগণের সেবায়, আমানতদারীতে, বিশ্বস্ততায়, আল্লাহর ভয়ে ভীত, নির্লোভ। তাঁর অধীনে যারা কাজ কোরবে তারা হবে তাঁর মতোই চরিত্রবান। সমস্ত সফলতার কৃতিত্ব হবে আল্লাহর, সমস্ত ভালো কাজের বিনিময় নেবে মানুষ আল্লাহর কাছ থেকে। সরকারের সকল কাজের সমালোচনা হবে প্রকাশ্যে এবং সামনাসামনি, কারো পেছনে কেউ সমালোচনা করতে পারবে না, ষড়যন্ত্রের তো প্রশ্নই আসেনা। কারো কোনো ভুল থাকলে তার সামনে বলা, পেছনে বলা যাবে না, পেছনে সমালোচনা হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ, এসলামের দৃষ্টিতে হবে মোনাফেকী কারণ এটা জাতির ঐক্যবিনাশী কাজ। ট্রেনের একজন বোঝা বহনকারী কুলি যেমন মানুষ আর যিনি জাতির এমাম (Leader) তিনিও মানুষ, কোনো বৈষম্য থাকবে না। এমন কি জাতির নেতা বা এমাম নিজেও পেশায় কুলি হোতে পারেন। মানব জাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত পানি, বাতাস, অর্থৎ প্রকৃতিকে কেউ দূষিত কোরতে পারবে না যেটা নরহত্যার মত অপরাধ। কারণ প্রাকৃতিক ঐ ক্ষতিগুলোর কারণে শুধু মানুষই নয় অন্যান্য প্রাণীও কষ্ট পায়, এমনকি বিলুপ্ত হোয়ে যায়। একটা মানুষ পৃথিবীর সকল স্থানে ঘুরে বেড়াতে পারবে, আল্লাহর বৈধ করা যেকোন খাবার সে খেতে পারবে। কারণ দুনিয়া আল্লাহর, সব মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। একটা মাত্র শর্ত, আল্লাহ ছাড়া আর কারও হুকুম মানা যাবে না। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়ার ফলে মানুষ লাভ কোরবে অতুলনীয় শান্তি অর্থাৎ এসলাম। এই এসলামের দিকেই মানবজাতিকে আহ্বান কোরছেন যামানার এমামের আন্দোলন হেযবুত তওহীদ। সমস্ত মানবজাতিকে জাতপাত, বর্ণ গোত্রহীন এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত করার সূত্র বা ফর্মুলা কারও জানা নেই। কেউ এই বিরাট চিন্তাও করে না, এটা সম্ভব বোলেও অনেকে বিশ্বাস কোরবেন না। কিন্তু সেটা সম্ভব এবং সেই বিরাট অতিমূল্যবান সূত্র মহান আল্লাহ হেযবুত তওহীদকে দিয়েছেন। সেই সূত্র হোল আল্লাহর তওহীদ– খুব সরল একটি ঘোষণা “আমি আল্লাহ ছাড়া আর কারও হুকুম মানি না”, এবং এই কথার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

মানবজাতির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উপায় আছে কি?

আজকে হাজার হাজার মতে পথে মতবাদে, ভৌগোলিকভাবে, ভাষার ভিত্তিতে, এমন বিভিন্নভাবে মানবজাতি খণ্ড বিখণ্ড হোয়ে আছে; এই ঐক্যহীন মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রথম সূত্রটা কি হবে? এটা সমগ্র মানবজাতির জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। আজ যদি পৃথিবীর ৭৫০ কোটি মানুষকে এই প্রশ্নটি করা হয়, না হোলেও কয়েক কোটি ধরণের উত্তর পাওয়া যাবে। এ অবস্থাতেই বোঝা যায় যে, মানবজাতির ঐক্যবদ্ধ হওয়া কতটা দুরূহ ব্যাপার।

প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর অতি সরল। সেই উত্তর জানতে হোলে আমাদেরকে নবী করিম (সা:) এর জীবনের দিকে তাকাতে হবে, কারণ তিনিই মানবজাতির জন্য একমাত্র আদর্শ, অনুসরণীয় মহামানব। তিনি মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কি কোরেছেন? তিনি যখন আবির্ভূত হোলেন তখন মক্কার তথা আরবের সমাজ ব্যবস্থা ছিল গোত্রভিত্তিক। গোত্রপতিরাই গোত্রের আইন কর্তা হিসেবে সমাজ পরিচালনা থেকে যুদ্ধ পর্যন্ত ইত্যাদি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ কোরত। প্রত্যেক গোত্র ছিল পৃথক, তাদের নিয়মকানুন ও সংস্কৃতির মধ্যেও বিস্তর ফারাক ছিল। একেক গোত্র ছিল একেক মূর্তির উপাসক।

মদীনায় বিভিন্ন গোত্রের বাস ছিল। সেখানে ইহুদি, বিভিন্ন মূর্তিপূজারী, অগ্নি উপাসক সবই ছিল। মক্কার লোকগুলো নিজেদেরকে দীনে হানিফের অন্তর্ভুক্ত মনে কোরলেও তাদের অনুসৃত দীন প্রকৃত অবস্থায় ছিল না, তারা চরমভাবে মূর্তিপূজায় নিমজ্জিত ছিল। তাদের মধ্যেও নানা গোত্রীয় বিভক্তি ছিল। ধর্মকে বিশ্বাস কোরতো না এমন লোকও কিছু ছিলো। আরবের এই গোত্রগুলির মধ্যে দাঙ্গা, ফাসাদ, যুদ্ধ, বিগ্রহ লেগেই থাকতো। তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণ নিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম যুদ্ধ চালিয়ে যেত। এটাই ছিল তাদের জীবন। এই শতধাবিচ্ছিন্ন সমাজটাকে আল্লাহর রসুল কী কোরে ঐক্যবদ্ধ কোরলেন? প্রথম তিনি ঘোষণা দিলেন "তোমরা বলো লা এলাহা এল্লাল্লাহ- আল্লাহর হুকুম ছাড়া আমরা কারো হুকুম মানবো না" এই কথাটুকু। যদি তোমরা এইটুকু ঘোষণা দাও তবে তোমরা 'ফালাহ' অর্থাৎ সাফল্য লাভ কোরবে, অর্থাৎ দুনিয়াতে শান্তি ও সম্মান পাবে আর আখেরাতে পাবে জান্নাত। এরপর তিনি আরও বোললেন, 'সমস্ত দুনিয়া তোমাদের পায়ের নিচে আসবে শুধু তোমরা তওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ

হও।' এভাবে রসুল ঐক্যবদ্ধ করণ প্রক্রিয়া শুরু কোরলেন। কারণ তাঁর উপরে দায়িত্ব ছিলো সমস্ত মানব জাতিকে আল্লাহর সত্যদীনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করার। সুতরাং পুরো মানবজাতি ঐক্যবদ্ধ হোতে হবে যে মূল সূত্রের ভিত্তিতে সেটা হোল আল্লাহর তওহীদ। শুরুতে অনেক বাধা আসলো তবুও পরবর্তীতে তওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া শুরু হোল। হোতে হোতে মদীনার গৃহযুদ্ধরত জাতি আউস-খাজরাজ ঐক্যবদ্ধ হোল, ইহুদীরা ঐক্যবদ্ধ হোল, শেষ পর্যন্ত মক্কার লোকেরা ঐক্যবদ্ধ হোল এবং এভাবে হোতে হোতে পুরো আরব ঐক্যবদ্ধ হোল এই কথার উপরে "আল্লাহর ছাড়া কারো হুকুম মানি না"। পরে অর্ধ পৃথিবী এই একটি কথার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হোল এবং পরিণামে অকল্পনীয় শান্তি ও নিরাপত্তা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হোল। আজকে সারা পৃথিবীতে মোসলেম নামক এই জাতির মধ্যে শিয়া, সুন্নি, শাফেয়ী, হাম্বলি, হানাফী, কাদিয়ানী, বাহায়ী তরিকাগত হাজার ভাগে বিভক্ত। শিয়াকে সুন্নী বানানো সম্ভব নয়, সুন্নীকে শিয়া বানানোও সম্ভব নয়। অপরদিকে মানবজাতি বিভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে হাজার হাজার রাজনৈতিক দলে, উপদলে বিভক্ত। এই সহস্রভাগে বিভক্ত মানবজাতিকে এবং মোসলেম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার সূত্রটা কি হবে? শিয়ারা, সুন্নীরা, হাম্বলি, হানাফীরা হাজার হাজার মত দাঁড় কোরিয়ে রেখেছে। তাদের একটি দলের সঙ্গে আরেকটি দলের দাড়ি, টুপি, পাগড়ির আকৃতি-প্রকৃতি নিয়েও বাহাস হয়। কেউ তাদের নিজস্ব লেবাস থেকেও সরতে রাজি না। সুতরাং এই সব ক্ষুদ্র বিষয়ের উপরে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা অসম্ভব ব্যাপার। একদল মনে করে বোমা মেরে সন্ত্রাস কোরে এসলাম প্রতিষ্ঠা কোরতে হবে, আরেকদল গণতান্ত্রিকভাবে এসলাম প্রতিষ্ঠা পক্ষে। এরাও কেউ অন্যের নিয়মগুলি মেনে নিতে রাজি নয়। যারা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি করে তারা ধর্মীয় দলগুলি সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবে না। তাহোলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সূত্র কি? ১৪০০ বছর পরে এসে সেই বড় প্রশ্ন, প্রথম প্রশ্ন সবার সামনে দাঁড়িয়েছে - এখন ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সূত্র কি?

এর উত্তর হোল, সবাইকে একটি সাধারণ কথা মেনে নিতে হবে যে, 'লা এলাহা এল্লাল্লাহ'- আমরা আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর কারো হুকুম মানি না। শিয়া, সুন্নি,সাফী, হাম্বলি, হানাফী এবং অন্যান্য মতবাদের অনুসারী যারা আছে তাদের মতবাদ দুনিয়াতে চালিত কোরে দেখা হোয়েছে যে শান্তি আসে নাই অতএব তোমরা সবাই আসো একটা কথার উপরে যে আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারো হুকুম মানি না।

পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ তাঁর রসুলকে বোলছেন, "বোলুন, হে কেতাবের অধিকারীরা! তোমরা সবাই একটি বিষয়ের দিকে আসো যা তোমাদের ও আমাদের মাঝে সমান যে আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও এবাদত (অর্থাৎ প্রতিনিধিত্ব) কোরব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত কোরব না, এবং একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে প্রভু বানাবো না (সুরা এমরান ৬৪)। এসলামের মধ্যে আজ যত দলাদলি, ফেরকা মাজহাব আছে তাদের মধ্যে হাজারো বিষয় নিয়ে মতভেদ থাকলেও লা-এলাহা এল্লা আল্লাহ এই কথার ব্যাপারে তারা আকীদাগতভাবে সবাই একমত। সুতরাং সেই সব ফেরকাকে এই কথার উপরই ঐক্যবদ্ধ হোতে হবে। অন্য ধর্মের লোকদেরও বুঝতে হবে, বিশ্বাস কোরতে হবে যে তাদের ধর্মগুলিও স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত কিন্তু মানুষ সেগুলিকে বিকৃত কোরে ফেলেছে, কোন ধর্মের অনুসারীরাই তাদের ধর্মের বিধান মানছে না, মানতে পারছে না। তাদের প্রত্যেককেও একটা কথার উপরে আসতে হবে আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর কারো হুকুম মানি না। শিয়া সুন্নির কে এসলাম থেকে কতটা দূরে সোরে গিয়েছে সেটা পরিমাপ করার সময় এটা নয়, শুধু একটা সত্য সবাই জেনে রাখুন, আল্লাহর হুকুম না মানার কারণে এরা সবাই এসলাম থেকে বহিষ্কার হোয়ে গেছে এবং পুরো মানব জাতি কাফের মোশরেক হোয়ে গেছে। কাজেই পুরো মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার মত একটি মাত্র সূত্র আছে, আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারো হুকুম মানি না, সেদিন পরস্পর দ্বন্দ্ব-বিবাদে লিপ্ত খণ্ড-বিখণ্ড আরবজাতিকে মহানবী যে মূলমন্ত্রের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ কোরেছিলেন, আজও অসংখ্য মতে-পথে বিচ্ছিন্ন এই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সেই তওহীদ ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। রসুলাল্লাহ এই কথা দিয়ে এই বিবদমান আরব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ কোরেছিলেন। তারপরে যখন ঐক্যবদ্ধ হবে তখন সেই ঐক্য প্রক্রিয়া যেন দীর্ঘস্থায়ী হয়, সেটা যেন কোনভাবে না ভাঙ্গে তার পরবর্ত্তী ব্যবস্থা হিসাবে আল্লাহ রাখলেন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাহ, তারপরে সপ্তাহে একদিন জুম'আ, তারপরে বছরে একদিন হজ্ব ইত্যাদি প্রক্রিয়া।

জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রক্রিয়া সালাহ ও হজ্ব

দীন শব্দের অর্থ জীবন-ব্যবস্থা, জীবন-বিধান। যে আইন-কানুন, নিয়ম দণ্ডবিধি মানুষের সমষ্টিগত, পারিবারিক, সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রণ

কোরবে সেটারই একত্রিত, সামগ্রিক রূপ হোচ্ছে দীন। এ দীন আল্লাহর সৃষ্টও হোতে পারে, মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূতও হোতে পারে, দু'টোই দীন। মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত যে দীন তা স্বভাবতঃই ভারসাম্যহীন, কারণ তা অতি সীমিত জ্ঞান থেকে তৈরী। আর আল্লাহ যে দীন সৃষ্টি কোরেছেন তা ভারসাম্যযুক্ত (সুরা বাকারা ১৪৩)। মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আইন দণ্ডবিধি ইত্যাদি মানুষের জীবনের সমষ্টিগত ও তার আত্মার যত রকমের প্রয়োজন তার সব কিছুরই একটা ভারসাম্যপূর্ণ মূল-নীতি নির্দেশনা। সুতরাং এই শেষ দীনের অন্যান্য সব বিষয়ই ভারসাম্যপূর্ণ। এতে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ইত্যাদির যেমন অংশ আছে তেমনি আত্মার উন্নতির, পরিচ্ছন্নতারও অংশ আছে, দু'টোই আছে, এর যে কোনো একটির গুরুত্ব কমিয়ে দিলেই আর সেই ভারসাম্য থাকবে না, তা আর দীনে ওয়াসাতা থাকবে না, তা আজকের এই বিকৃত এসলাম হোয়ে যাবে। যে কারণে আল্লাহর প্রতি মন-সংযোগ জামাতের সালাতের (নামাজ) চেয়ে নির্জনে অনেক বেশী হওয়া সত্ত্বেও ফরদ হোচ্ছে ঐ জামাতে যোগ দেওয়া, ঠিক সেই কারণে নির্জনে বোসে আল্লাহকে ডাকায় বেশী মন-সংযোগ, নিবিষ্টতা (Concentration) হওয়া সত্ত্বেও আদেশ হোচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষের কোলাহলে, জনতার সাথে একত্র হোয়ে হজ্বে গিয়ে তার সামনে হাজির হওয়া। কারণ অন্যান্য বিকৃত ধর্মগুলির মত শেষ এসলামের আকীদা শুধু একতরফা অর্থাৎ আত্মার ধোয়ামোছা, পরিষ্কার পবিত্রতা নয়। শেষ এসলামের প্রথম ও মুখ্য দিকটা হোচ্ছে জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, ব্যক্তিগত দিকটা গৌণ যদিও ভারসাম্যযুক্ত। তাই ফরদ অর্থাৎ অবশ্যই করণীয়, যেটা না কোরলে চোলবে না, সেই ফরদ সালাহ কায়েম করার আদেশ জামাতে, সবার সঙ্গে, হজ্ব করার আদেশ হোচ্ছে বিশাল জন সমাবেশে। আর নফল সালাহ অর্থাৎ ব্যক্তিগত সালাহ যা আবশ্যিক নয়, ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হোয়েছে। এ থেকেই তো পরিষ্কার হোয়ে যায় যে এসলামে জাতীয় বিষয়ই প্রধান ও মুখ্য। ফরদ অর্থাৎ জাতীয় বিষয়গুলিকে বাদ দিয়ে নফল অর্থাৎ ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে থাকলে তা জায়েজ হবে না, যেমন জায়েজ হবে না ফরদ সালাহ বাদ দিয়ে রাত ভর নফল সালাহ পড়লে। সালাহ যেমন জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্যযুক্ত হজ্বও তেমনি। বলা যায় জামাতে নামাযেরই বৃহত্তম সংস্করণ হজ্ব। এই দীনের সমস্ত জাতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হোচ্ছে এবাদতের স্থানগুলি অর্থাৎ মসজিদ, কারণ মোসলেমের জীবনের, জাতীয় ও ব্যক্তিগত উভয় জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য

এবলিসের চ্যালেঞ্জে আল্লাহকে জয়ী করানো ও পৃথিবীতে ন্যায় বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা। সুতরাং মোসলেমের জীবনে ইহজীবন ও পরজীবনের, দেহের ও আত্মার কোনো বিভক্তি

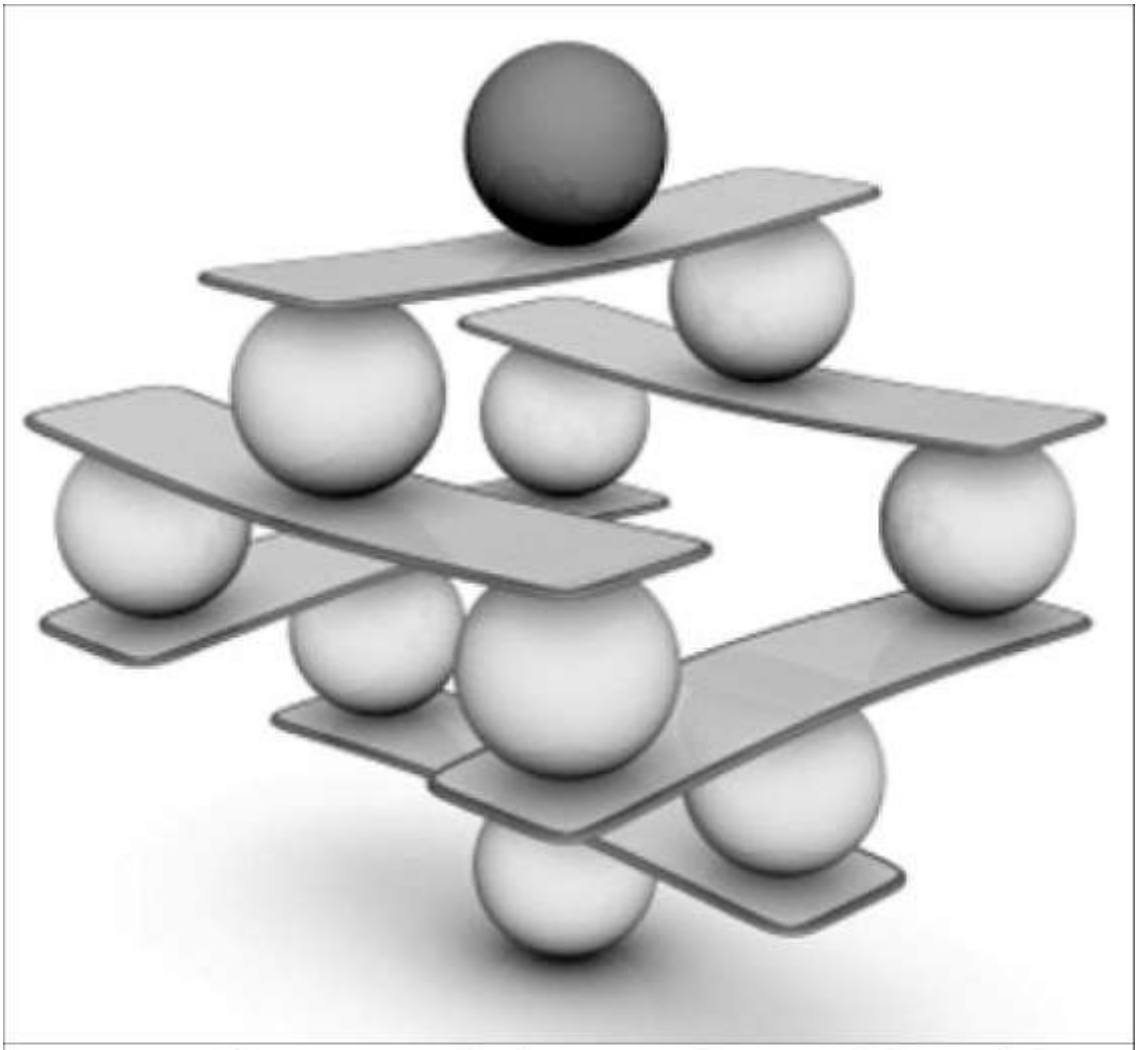

আল্লাহর শেষ দীনের অন্যান্য সব বিষয়ই ভারসাম্যপূর্ণ। এতে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ইত্যাদির যেমন অংশ আছে তেমনি আত্মার উন্নতির, পরিচ্ছন্নতারও অংশ আছে, দু'টোই আছে, এর যে কোনো একটির গুরুত্ব কমিয়ে দিলেই আর সেই ভারসাম্য থাকবে না, তা আর দীনে ওয়াসাতা থাকবে না, তা আজকের এই বিকৃত এসলাম হোয়ে যাবে।

থাকতে পারে না কারণ দেহ থেকে আত্মার পৃথকীকরণ বা আত্মা থেকে দেহ পৃথকীকরণের একটাই মাত্র পরিণতি–মৃত্যু। তাই এই জাতির সমস্ত কর্মকাণ্ড এক অবিচ্ছিন্ন এবাদত। জামাতে নামাযের উদ্দেশ্য হোল মোসলেম পাঁচবার তাদের স্থানীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র মসজিদে একত্র হবে, তাদের স্থানীয় সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা পরামর্শ কোরবে, সিদ্ধান্ত নেবে, তারপর স্থানীয় এমামের নেতৃত্বে তার সমাধান

কোরবে। তারপর সপ্তাহে একদিন বৃহত্তর এলাকায় জামে মসজিদে জুমা'র নামাযে একত্র হোয়ে ঐ একই কাজ কোরবে। তারপর বছরে একবার আরাফাতের মাঠে পৃথিবীর সমস্ত মোসলেমদের নেতৃস্থানীয়রা একত্র হোয়ে জাতির সর্বরকম সমস্যা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ইত্যাদি সর্বরকম সমস্যা, বিষয় নিয়ে আলোচনা কোরবে, পরামর্শ কোরবে, সিদ্ধান্ত নেবে। অর্থাৎ স্থানীয় পর্যায় থেকে ক্রমশঃ বৃহত্তর পর্যায়ে বিকাশ কোরতে কোরতে জাতি পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু মক্কায় একত্রিত হবে। একটি মহাজাতিকে ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধনে বেঁধে রাখার কী সুন্দর প্রক্রিয়া।

আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দ:) এ অপূর্ব সুন্দর প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট কোর দিলেও তা এই জাতির ঐক্যকে ধোরে রাখতে পারলো না আকীদার বিকৃতির কারণে। এই দীনের অতি বিশ্লেষণ কোরে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মসলা-মাসায়েল উদ্ভাবন কোরে জাতিটাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কোরে একে এক মৃতপ্রায় জাতিতে পরিণত কোরে দেওয়ার পরও এর সব রকম, অর্থাৎ জাতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র মসজিদ ও কাবাই ছিলো, কারণ তখনও এই দীনকে জাতীয় ও ব্যক্তিতে বিভক্ত করা হয় নি। তারপর যখন ঐ ঐক্যহীন, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন জাতিটাকে আক্রমণ কোরে ইউরোপীয় জাতিগুলি দাসে পরিণত কোরে খণ্ড খণ্ড কোরে এক এক জাতি এক এক খণ্ড শাসন ও শোষণ কোরতে শুরু করলো তখন ঐ শাসনের সময় জাতির জীবনকে জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে ভাগ করা হোল অর্থাৎ দেহ থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করা হোল এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে জাতি একটি মৃত জন-সংখ্যায় পরিণত হলো। সালাহ, হজ্ব এমন কি তওহীদ, কলেমাও হোয়ে গেলো 'এবাদত' ব্যক্তিগত উপাসনার বিষয়, যেখানে রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক কোনো কিছুর স্থান নেই। আল্লাহর আইন ও দণ্ডবিধির তো কোনো প্রশ্নই উঠে না, কারণ সেগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেখানে ইউরোপীয় খ্রিস্টান ইহুদিদের তৈরী আইন, অর্থনীতি, দণ্ডবিধি, শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলো। ঐ সময় থেকেই দুই এলাহ গ্রহণ করার ফলে এই জাতি কার্যতঃ মোশরেক ও কাফের হোয়ে আছে। যদিও আকীদার বিকৃতির কারণে তা উপলব্ধি করার মত বোধশক্তিও অবশিষ্ট নেই।

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী'র লেখা থেকে

মানবজাতি এক জাতি হবে

মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ দেখলেন, আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি-যোগাযোগ-বিবেক-কৃষ্টি ইত্যাদি এক কথায় বিবর্তনের এমন একটা বিন্দুতে পৌঁছলো সে সমগ্র মানব জাতির জন্য একটি মাত্র জীবন-বিধান গ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত, তৈরী হোয়েছে। এটা মহান স্রষ্টার মহা পরিকল্পনারই একটি অংশ, যে পরিকল্পনা তিনি তার প্রতিনিধি মানুষ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেয়ার সময়ই কোরেছিলেন। মানুষ বিবর্তনের এই বিন্দুতে পৌঁছামাত্র আল্লাহ পাঠালেন মোহাম্মদ বিন আব্দাল্লাহকে (দ:)। পূর্ববর্তী প্রেরিতদের মত তাঁর মাধ্যমেও আল্লাহ পাঠালেন সেই দীনুল কাইয়্যেমা-সেরাতুল মোস্তাকীম অর্থাৎ আল্লাহকেই একমাত্র বিধাতা, সার্বভৌম হুকুমদাতা হিসাবে স্বীকার কোরে নেওয়া। ঐ সেরাতুল মোস্তাকীমকে ভিত্তি কোরে যে সংবিধান এলো সেটা এবার এলো সমস্ত মানব জাতির জন্য (কোর'আন- সূরা আত-তাকভীর ২৭)। আগের মত নির্দিষ্ট কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর জন্য নয়। এর পরিষ্কার অর্থ হোল এই যে আল্লাহ চান যে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন মানব জাতি নিজেদের ভেদাভেদ ভুলে আবার একটি মাত্র জাতিতে পরিণত হোক। কারণ, তারা আসলে গোড়ায় একই বাবা-মা, আদম-হাওয়ার (Adam-Eve) সন্তান অর্থাৎ একই জাতি কারণ তারা একই বাবা মা থেকে সৃষ্ট। স্বাভাবিক কারণে তারা বিচ্ছিন্ন হোয়ে গিয়েছিলো কিন্তু এখন আবার সময় এসেছে এক হোয়ে শান্তিতে বসবাস করার অর্থাৎ আল্লাহ চান তাঁর এই প্রিয় সৃষ্টি বনি আদম আবার সকল বর্ণ, সকল ভেদাভেদ ভুলে তারা একটি জাতিতে পরিণত হোক। একটি জাতিতে পরিণত করার জন্য তিনি এমন একটি জীবন-ব্যবস্থা দিলেন, যেটা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি নির্ভর অর্থাৎ দীনুল ফেতরাহ। প্রাকৃতিক উপাদান বায়ু থেকে অক্সিজেন, সূর্য থেকে উত্তাপ গ্রহণের ক্ষেত্রে যেমন পৃথিবীর কোনো জাতি বর্ণের মধ্যে কোনো বৈষম্য নেই, তেমনিভাবে এই দীনটিও সকল এলাকার সকল মানুষ সমানভাবে গ্রহণ কোরতে পারবে। এই জীবনব্যবস্থা সমানভাবে সকল এলাকার মানুষের প্রয়োজন পূরণ কোরতে পারবে। নতুন সংবিধানে তিনি বোললেন, "হে মানব জাতি! আমি তোমাদের একটি মাত্র পুরুষ ও একটি মাত্র স্ত্রী থেকে সৃষ্টি কোরেছি। জাতি গোষ্ঠীতে তোমাদের পরিণত কোরেছি যাতে তোমরা নিজেদের চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে যে

যত বেশী ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে সতর্ক, আল্লাহর চোখে সে তত বেশী সম্মানিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুই জানেন। সব কিছুরই খবর রাখেন (কোর'আন- সূরা আল-হুজরাত ১৩)। এখানে আল্লাহ তিনটি কথা মানুষকে বোলেছেন। ক) মানুষকে তিনি মাত্র একটি দম্পতি থেকে সৃষ্টি কোরেছেন অর্থাৎ সমস্ত মানব জাতি একই বংশের একই রক্তের; সুতরাং একই জাতি। খ) দেহের গঠনে, চামড়ার রংয়ে, ভাষায় ইত্যাদিতে যে বিভক্তি এ শুধু পরিচয়ের জন্য, তার বেশী কিছুই নয়।

এই কথাটা একটু পরিষ্কার করা দরকার। একটি লোকের কয়েকটি সন্তান আছে। সন্তানরা কেউ কালো, কেউ ফর্সা, কেই বাদামী, কেউ লম্বা, কেউ খাটো, কেউ মোটা, কেউ পাতলা। এদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা নাম রাখা হয়। কেন? নিশ্চয়ই পরিচিতির জন্য। আল্লাহ বোলছেন 'মানব জাতিকে শুধু ঐ পরিচিতির জন্যই বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীতে, গায়ের রংয়ে, ভাষায় ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হোয়েছে। তাছাড়া এটা আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলতার এক অন্যন্য সৌন্দর্য। যদি সকল মানুষ সাদা হোত অথবা সকল মানুষ একই উচ্চতার হোত তাহোলে সৌন্দর্যের কোনো মানদণ্ড থাকতো না, যেমন হাতের ৫টি আঙ্গুল একেকটি একই আকৃতির এবং প্রত্যেকটিরই আলাদা-আলাদা সৌন্দর্য এবং কার্যকারিতা রোয়েছে। এর মানে এই নয় যে খাট আঙ্গুলটি শ্রীহীন ও কম গুরুত্বপূর্ণ। তাহোলে বিভিন্ন বর্ণের হোলেও ঐ লোকটির সন্তানদের মতই পুরো মানবজাতি ভাই-বোন, একই জাতি। অর্থাৎ আল্লাহ মানুষে মানুষে ভেদাভেদ-বৈষম্য মিটিয়ে দিচ্ছেন। গ) মানুষে মানুষে তফাতের একটি মাত্র সংজ্ঞা নির্ধারণ কোরে দিলেন, সেটি হোল ন্যায়-অন্যায়। ভালো-মন্দ দেখে যে যত সতর্ক ভাবে চোলবে কাজ কোরবে- অর্থাৎ যে যত বেশী উন্নত চরিত্রের- সে তত বেশী আল্লাহর কাছে সম্মানিত। এক কথায় আল্লাহ বোলছেন মানুষ এক জাতি, কেউ কারো চেয়ে বড় নয়, ছোট নয়, সব সমান। ছোট-বড়র একটি মাত্র মাপকাঠি, সেটি হোল ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি। সেখানে চামড়ার রংয়ের, ভাষার, কোনো দেশে কার জন্ম বা বাস এসবের কোনো স্থান নেই। এবং ঐ ন্যায়-অন্যায়ের সংজ্ঞা হোচ্ছে সেটা, যেটা আল্লাহ তার সংবিধান কোর'আনে দিয়ে দিয়েছেন। এই আয়াতটি ছাড়াও আল্লাহ কোর'আনের বিভিন্ন স্থানে বোলেছেন একই আদম-হাওয়া থেকে সৃষ্ট বোলে সমস্ত মানব জাতি এক জাতি। সুতরাং এ কথা পরিষ্কার হোয়ে যাচ্ছে যে, ভৌগোলিক বা গায়ের রং, ভাষা ইত্যাদি ভিত্তিক জাতি আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থার সরাসরি

পরিপন্থী, উল্টো। একটা হোচ্ছে আদর্শের উপর ভিত্তি কোরে, যে আদর্শ হোচ্ছে 'লা এলাহা ইল্লাল্লাহ, মোহাম্মাদুর রসুলাল্লাহ', অন্যগুলি হোচ্ছে মানুষের খেয়ালখুশী মত পৃথিবীর বুকের উপর লাইন টেনে গায়ের রংয়ের উপর বা ভাষার উপর ভিত্তি কোরে। দু'টো একত্রে চোলতে পারে না- অসম্ভব, একথা বুঝতে পণ্ডিত হবার দরকার নেই।

আজ সারা পৃথিবী জুড়ে চামড়ার রং, ভাষা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করা জাতিগুলি প্রত্যেকটি নিজেদের ছাড়া বাকী মানব গোষ্ঠী থেকে আলাদা, স্বতন্ত্রভাবে দেখে; শুধু স্বতন্ত্রভাবেই দেখে না বর্তমানে এক দেশ আর এক দেশের সঙ্গে শত্রুভাবাপন্নে পরিণত হোয়েছে। এর কারণ ঐ সব জাতিগুলির প্রত্যেকটির জাতীয় স্বার্থ বিভিন্ন অর্থাৎ একেক জাতির একেক স্বার্থ। তাদের প্রত্যেকেরই মনোভাব হোচ্ছে যে কোনো উপায়েই হোক নিজের স্বার্থ রক্ষা কোরতেই হবে, এতে পাশ্ববর্তী দেশের কত মানুষ হত্যা কোরতে হবে, কত বাড়ী-ঘর, জনপথ ধ্বংস করা হবে তার কোনো হিসাব করার প্রয়োজন নাই, কোনো ন্যায়-নীতি, মানবতার বালাই নাই। নিজ দেশের সীমান্তে নদীর গতিপথে বাঁধ দিয়ে অন্যদেশকে মরুভূমিতে পরিণত কোরে দেওয়া ন্যায়সঙ্গত কোরে নিয়েছে। মানুষ জীবিকা ও অন্য কোনো প্রয়োজনে এই সীমানা অতিক্রমের চেষ্টা কোরলে সীমান্তরক্ষীদের গুলি তাদেরকে ঝাঁঝরা কোরে দেয়। অথচ পৃথিবীর এই মাটি থেকে আদমকে সৃষ্টি করা হোয়েছে, এই মাটিতেই আবার সকল আদম সন্তানকে ফেরতে যেতে হবে সুতরাং সৃষ্টিগতভাবেই এই মাটির উপর, এই পৃথিবীর উপর মানুষের পূর্ণ অধিকার, হক রোয়েছে। মানুষ ইচ্ছা কোরলে এই পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যেতে পারে, যে কোনো জায়গায় বসবাস করতে পারে। এই পৃথিবী আল্লাহ মানুষের জন্যই সৃষ্টি কোরেছেন। তিনি বোলেছেন মানুষ হোচ্ছে পৃথিবীর বুকে তাঁর প্রতিনিধি, খলিফা। এখানে তিনি পৃথিবীর বুকে কোনো বিভক্তিরেখা আরোপ করেন নি। সুতরাং এই সম্পূর্ণ পৃথিবীর উপর প্রতিটি মানুষের সৃষ্টিগত অধিকার। সেই অধিকারবলে এই মাটির সর্বত্র সে যেতে পারে- এই পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় ন্যায়সঙ্গতভাবে ফসল ফলাতে পারে, কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না। এই পৃথিবীর বুকে আল্লাহ যা হালাল কোরেছেন তা থেকে যার যা খেতে ইচ্ছা কোরবে তা খেতে পারে, কেউ বাধা দিতে পারে না। অন্যের কোনো ক্ষতি না কোরে, অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না হয় এমন সব কাজ সে কোরতে পারে। মানুষের স্রষ্টা, প্রভু, রব, মালেক আল্লাহ মানুষকে এই

অধিকার দিয়ে রেখেছেন, দাঙ্গালীয় সভ্যতা এসে মানুষের যাবতীয় অধিকার হরণ কোরেছে বিভিন্ন সীমারেখা দিয়ে। ফলে মানুষের মধ্যে স্থায়ী সংঘাত, সংঘর্ষের রূপ নিয়েছে, এই সংঘর্ষের প্রবণতা সব চেয়ে বেশী প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে, একথা যে কোনো সময়ে পৃথিবীর রাজনৈতিক ও সামরিক

পৃথিবীর বহু দেশে এটা প্রাত্যহিক দৃশ্য। শান্তির আশায় মানুষে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দেশের সীমান্ত পার হোতে যেয়ে পাখির মত গুলি খেয়ে মরছে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস লক্ষ্য কোরলেই পরিস্ফুট হোয়ে উঠবে। কারণ ঐ একই। 'মানুষ এক জাতি' আল্লাহর এই কথা অস্বীকার কোরে পৃথিবীর বুকের উপর খেয়াল খুশী মত দাগ দিয়ে, লাইন টেনে, চামড়ার রংয়ের উপর ভাষার উপর ভিত্তি কোরে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি কোরে চিরস্থায়ী সংঘাত-সংঘর্ষ-রক্তপাত ও যুদ্ধের ব্যবস্থা করা। যতদিন এই কৃত্রিম ব্যবস্থা পৃথিবীতে চালু থাকবে, ততদিন মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে অশান্তি, যুদ্ধ রক্তপাত কেউ বন্ধ কোরতে পারবেন না। শত লীগ অব নেশনসও (League of Nations) নয়, শত জাতিসংঘ ও (United Nations) নয়। মালায়েকরা মানুষ তৈরীর বিরুদ্ধে যে যুক্তি দিয়েছিলেন; এবলিস মানুষকে দিয়ে যা করাবে বোলে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে- অর্থাৎ সেই ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমা- অশান্তি, অন্যায়, রক্তপাত ও যুদ্ধ যাতে চোলতে থাকে সেজন্য শয়তানের হাতে যত অস্ত্র আছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান অস্ত্র হোচ্ছে এই ভূগোল, চামড়ার রং, ভাষা ইত্যাদির উপর ভিত্তি কোরে মানব জাতিকে বিভক্ত করা। এবং এই জন্যই এই ব্যবস্থা শেষ এসলামে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। এই ব্যবস্থা মানুষ জাতির কত অশান্তি, অন্যায়, অবিচার, রক্তপাত, যুদ্ধ, অশ্রু ও ভগ্ন হৃদয়ের কারণ হোয়েছে- হোচ্ছে, তা সমুদ্রের মত সীমাহীন।

এই দীনের, জীবন-ব্যবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য হোচ্ছে পৃথিবীতে সব রকম অন্যায়-অবিচার, শোষণ, অশান্তি, রক্তপাত বন্ধ কোরে শান্তি (এসলাম) প্রতিষ্ঠা করা। এইটাই হোল আল্লাহর প্রতি এবলিসের চ্যালেঞ্জ, যে চ্যালেঞ্জ আল্লাহ গ্রহণ কোরেছেন। ফেরেশতারা, মালায়েকরা বোলেছিলেন এই নতুন সৃষ্টি মানুষ পৃথিবীতে অশান্তি (ফাসাদ) ও রক্তপাত (সাফাকুদ্দিমা) কোরবে। ফাসাদ শব্দের অর্থের মধ্যে অশান্তি, অবিচার, শোষণ, অত্যাচার সব কিছুই আসে আর সাফাকুদ্দিমা শব্দের অর্থের মধ্যে খুন, যখম, যুদ্ধ ইত্যাদি সব কিছুই আসে। মালায়েকরা মানুষ সৃষ্টির বিরুদ্ধে এ যুক্তি আল্লাহর কাছে পেশ করেন নি যে মানুষ তোমার এবাদত কোরবে না, সালাহ, সওম, হজ্ব কোরবে না, মন্দিরে, মসজিদে, গীর্জায়, সীনাগগে আর প্যাগোডায় যাবে না। আজ পৃথিবীময় মানুষ মসজিদে, মন্দীরে, সীনাগগে, প্যাগোডায় আর গীর্জায় শুধু ভীড় কোরছে তা নয়, ওগুলোতে জায়গা পাওয়া মুশকিল। প্রতিদিন শত শত নতুন উপাসনালয় পৃথিবীতে তৈরি হোচ্ছে, তাও উপাসকদের জায়গা হোচ্ছে না। এ ছাড়াও নানাভাবে মানুষ যার যার ধর্মের সমস্ত রকম অনুশাসন প্রাণপণে পালন কোরতে চেষ্টা

কোরছে। কি ফল হোচ্ছে? পৃথিবীতে অন্যায়, অবিচার, মযলুমের ক্রন্দন, রক্তপাত, যুদ্ধ, হত্যা কমছে? অবশ্যই নয়। পরিসংখ্যান নিঃসন্দেহে বোলে দেবে যে ওগুলো অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেড়ে যাচ্ছে। এটা কাউকে বোলে দিতে হবে না যে, এই সকল যুদ্ধের পেছনে জাতিগত বিভেদ, বিভক্তি একটি বড় কারণ। এই শতাব্দীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধে চৌদ্দ কোটি বনি আদম যে শুধু হতাহত হোয়েছে তাই নয়, ঐ যুদ্ধের পর সংঘাত এড়াবার মানবিক প্রচেষ্টার ফল জাতিসংঘের (United Nations) জন্মের পরও শুধু ২০০০ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধে ৪০,৯৬৮,০০০ (চার কোটি নয় লক্ষ আটষট্টি হাজার) মানুষ শুধু নিহতই হোয়েছে, আহতদের সংখ্যা স্বভাবতই এর দশ গুণের বেশি (Stockholm International Peace Research Institute)। আর এই নতুন শতাব্দীর একটি দিনও অতিবাহিত হয় নি, যেদিন পৃথিবীতে যুদ্ধ ও রক্তপাত হয় নি। শুধুমাত্র ইরাক ও আফগানিস্তানেই নিহত হোয়েছে ১০ লক্ষ মানুষ, মায়ানমার, সিরিয়া, ফিলিস্তিন এসব দেশের কথা বাদই দিলাম। এই মৃত্যুর আনুষঙ্গিক যে দুঃখ, হাহাকার আর অশ্রু তা কোনো পরিসংখ্যানে নেই।

সকল আদম সন্তান একে অপরের ভাই বোন। তাদের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান সৃষ্টি কোরেছে হৃদয়বিদারী কাঁটাতার যা

শেষ নবী (দ:) সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হোয়েছেন অর্থাৎ তাঁর নবুয়ত সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। তাঁর উম্মাহর ব্যর্থতার জন্য তাঁর নবুয়ত সমস্ত মানব জাতিকে এর অন্তর্ভুক্ত কোরতে পারে নি, যদিও সেইটাই ছিলো উম্মতে মোহাম্মদীর উপর অর্পিত সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্ব। যেখানে সমস্ত মানবজাতিকেই বিশ্বনবীর (দ:) উম্মাহয় পরিণত করার জন্য তাঁকে পাঠানো হোয়েছে সেখানে স্থান, রং, ভাষা ইত্যাদির উপর ভিত্তি কোরে মানব জাতিকে অর্থাৎ তাঁর উম্মাহকে বহু ভাগে বিচ্ছিন্ন কোরে দেয়ার অনুমতি থাকতে পারে না, কারণ তাহোলে উম্মাহকে বিভক্ত কোরে দেয়া হয়, তাঁর উম্মাহর মধ্যে যে কোনো রকম বিভক্তি সৃষ্টিই কুফর। যেখানে এই শেষ জাতির-উম্মতে মোহাম্মদীর - ঐক্য অটুট রাখতে আল্লাহ কোর'আনে বহুবার

তাগিদ দিয়েছেন; তাঁর রসুল (দ:) বহু ভাবে সতর্ক কোরেছেন। ঐক্য নষ্ট হবার সামান্যতম কারণ দেখলে যখন তাঁর পবিত্র চেহারা রাগে লাল হোয়ে যেতো সেখানে ঐ ঐক্য ধ্বংসকারী ব্যবস্থাকে আল্লাহ ও রসুল (দ:) কোনক্রমেই অনুমতি দিতে পারেন না, এটা সাধারণ জ্ঞান, সুতরাং এটা হারাম। এ ছাড়াও আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে।

পৃথিবী নামের এই গ্রহটি মানব জাতির জন্য, বনি আদমের জন্য। এর বুকের উপর মনগড়া লাইন টেনে এই বনি আদমকে বহু ভাগে বিভক্ত কোরে চিরস্থায়ী সংঘর্ষের, দ্বন্দ্বের বন্দোবস্ত করার অনুমতি স্রষ্টা দেন নি। তিনি বোলেছেন সমস্ত মানব জাতি এক জাতি, একই আদম-হওয়ার সন্তান। স্রষ্টার সেই বাণী উপেক্ষা কোরে অহংকারী মানুষ যে ভৌগোলিক রাষ্ট্র (Nation State) স্থাপন করলো তার পরিণতি হোয়েছে সীমাহীন অন্যায়, ফাসাদ আর রক্তপাত। এ ছাড়া হোয়েছে পৃথিবীর জনসংখ্যাকে কৃত্রিম সীমান্তের মধ্যে আটকিয়ে রেখে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি করা হোয়েছে। ফল হোয়েছে এই যে পৃথিবীর কোথাও ছোট ভৌগোলিক রাষ্ট্রে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে মানুষ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চরম দুর্দশাগ্রস্থ হোয়ে অনাহারে কু-শিক্ষায় অশিক্ষায় ধুকে মরছে। অন্যদিকে অল্প জনসংখ্যার রাষ্ট্র পৃথিবীর বিরাট এলাকা দখল কোরে সেটার প্রাকৃতিক সম্পদ রাজার হালে ভোগ কোরছে। বর্তমানে তুলনামূলক ভাবে অল্প জনসংখ্যার কিন্তু বিরাট ভূ-ভাগ অধিকারী এমন রাষ্ট্র আছে সেখানে যে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন হয় তার একটা বিরাট অংশ জাহাজে কোরে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিতে হয়। অন্যদিকে বহু ছোট অথচ অতিরিক্ত জনসংখ্যার রাষ্ট্র আছে যে রাষ্ট্রের মানুষ হাজারে হাজারে না খেয়ে মরে যাচ্ছে। এর চেয়ে বড় অন্যায় এর চেয়ে বড় যুলুম আর কি হতে পারে? ঐ ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মানুষকে আটকে রাখা হোয়েছে, অবরুদ্ধ কোরে রাখা হোয়েছে। কৃষি কাজ কোরে মানুষের জন্য খাদ্য ফলানোর জন্য এদের প্রতি জনের জন্য কয়েক কাঠা জমিও ভাগে পড়ে না, অন্যদিকে ঐ বড় বড় রাষ্ট্রগুলিতে প্রতি জনের ভাগে লক্ষ লক্ষ একর পড়ে এবং তারপরও লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল অনাবাদি পড়ে থাকে চাষ করার মানুষের অভাবে। কৃষি ছাড়াও অর্থনীতির অন্যান্য দিক দিয়ে এই সমস্ত বিভাজন একই রকমের অন্যায় ও যুলুমের প্রত্যক্ষ কারণ। এক ভৌগোলিক রাষ্ট্র চূড়ান্ত ধনী, অন্যটি দারিদ্রের নিুতম পর্যায়ে নেমে পশু জীবন যাপন কোরছে। একটি তার বিরাট সম্পদ সীমান্তের ভেতর আটকে রাখছে, তাদের রাষ্ট্রের

মানুষ বাদ দেন কুকুর-বিড়াল যে মানের জীবন যাপন করে তা ঐ দরিদ্র রাষ্ট্রের মানুষগুলি স্বপ্নেও দেখতে পারে না। এই মহা অন্যায়, মহা যুলুম বন্ধ কোরতেই আল্লাহ ভৌগোলিক, গায়ের রং, ভাষা ইত্যাদি মানুষে মানুষে যত রকমের প্রভেদ হোতে পারে

উন্নত বিশ্বের অভিজাত কুকুরদের সুইমিং পুল। অথচ আজও বিশ্বের বহু দেশের ডাস্টবিনে মানবশিশু কুকুরের সঙ্গে উচ্ছিষ্ট কাড়াকাড়ি কোরে খায়।

সব কিছুকে নিষিদ্ধ কোরে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থার-দীনের নীতি হোল পৃথিবীর বুকে চামড়ার রং, ভাষা, গোত্র, গোষ্ঠী, কোনো কিছুরই বিভেদ থাকবে না। কারণ সমস্ত পৃথিবীর মানুষ এক জাতি। দীনের এই নীতি স্বীকার কোরে নিলে মানুষ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে যাবে। কোথাও জনসংখ্যার অস্বাভাবিক চাপ, কোথাও জনহীনতা থাকবে না। পৃথিবীর এক জায়গায় প্রাচুর্য, অন্য জায়গায় দারিদ্র্য থাকবে না। এক বালতি পানি মাটিতে ঢেলে দিলে যেমন পানি চারিদিকে ছড়িয়ে যেয়ে নিজের সমতলত্ব খুঁজে নেয়, সমান হোয়ে যায়, পানি কোথাও উঁচু কোথাও নিচু হোয়ে থাকে না, তেমনি জনসংখ্যা এবং সম্পদ পৃথিবীময় ছড়িয়ে যেয়ে সমান হোয়ে যাবে। অথচ মানুষ সীমান্তের বাঁধ দিয়ে মানুষের স্বাভাবিক স্রোতকে আটকিয়ে এক জায়গায় অতিরিক্ত জনসংখ্যা অন্য জায়গায় জনশূন্যতা, এক জায়গায় সম্পদের প্রাচুর্য অন্য জায়গায় কঠিন দারিদ্র্যের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোরে রেখেছে। এই চরম অন্যায়-ব্যবস্থা শেষ এসলামে অস্বীকার করা হোয়েছে। কিন্তু মানুষের গড়া রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক

ব্যবস্থা, আইন-দণ্ডবিধি ইত্যাদির সঙ্গে এই শেরক ব্যবস্থাও পৃথিবীর 'মোসলেম' জাতি গ্রহণ কোরেছে এবং কোরেও নামাজ-রোযা-হজ্ব-যাকাত-টুপি-পাগড়ী-নফল এবাদত-তসবিহ ইত্যাদি হাজার রকমের কাজ কোরে নিজেদের মহা মোসলেম মনে কোরছে আর পর জীবনে জান্নাতের আশা কোরছে। তারা ভুলে গেছে যে নফল এবাদত না কোরলেও রহমানুর রহীম আল্লাহ জান্নাত দিতে পারেন। কিন্তু শেরক ও কুফরকে ক্ষমা না করা হোচ্ছে তার অঙ্গীকার এবং তিনি কখনও তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না, কোরবেন না।

কাজেই আজ সারা পৃথিবীকে ভৌগোলিকভাবে দুই শতাধিক ভাগে, গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি মতবাদের ভিত্তিতে হাজার হাজার রাজনৈতিক দল গঠন কোরে, প্রতিটি ধর্মের মধ্যে থাকা হাজার হাজার দল, ফেরকা, মাজহাব ইত্যাদিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে দাজ্জাল অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা' এই মানবজাতিকে খণ্ড বিখণ্ড কোরে রেখেছে। এই সকল বিভক্তি মিটিয়ে দিয়ে সমগ্র বনী আদমকে একটা জাতিতে পরিণত করার জন্যই মহান আল্লাহ আখেরী নবীকে পাঠিয়েছেন। আজ মহানবীর উম্মত হিসেবে হেযবুত তওহীদ মানবজাতিকে সেই আহ্বান কোরছে। আল্লাহ ২ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ তারিখে একটি মহিমান্বিত মো'জেজা ঘোটিয়ে হেযবুত তওহীদকে তাঁর নিজের পরিচালিত আন্দোলন হিসাবে সত্যায়ন কোরেছেন, এর এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে সত্যায়ন কোরেছেন এবং মানবজাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যৎ জানিয়ে দিয়েছেন। সেটি হোল- অচিরেই আল্লাহর সত্যদীন এই হেযবুত তওহীদের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে এনশা'আল্লাহ। সুতরাং আজ যে অশান্তিময় পরিবেশে আমরা বসবাস কোরছি তার সমাপ্তি ঘোটতে যাচ্ছে। এবার আল্লাহর রসুলের প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী আবার জেগে উঠবে, এই জাতির কালঘুম টুটবে। মানবজাতির সামনে আবার নতুন কোরে উদ্ভাসিত হবে নবসভ্যতার সূর্য। আল্লাহর রসুলের নাম 'রহমাতাল্লেল আলামীন' বাস্তবে স্বার্থকতা লাভ কোরবে। মানবজাতিতে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না, সবাই হবে ভাই ভাই, একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। বাবা আদম (আ:) ও মা হাওয়ার সকল সন্তান তাদের লক্ষ লক্ষ বছরের অনৈক্য হানাহানি ভুলে পরস্পরকে আলিঙ্গন কোরবে। সেই শান্তি প্রতিষ্ঠা কি এমনি এমনি হবে? কখনওই নয়। এর জন্য আল্লাহর রসুলের প্রকৃত উম্মাহকে তাদের চূড়ান্ত কোরবানী ও ত্যাগ

স্বীকার কোরে সংগ্রাম কোরতে হবে, যেমনটা ত্যাগ স্বীকার কোরে গেছেন আল্লাহর রসুল ও তাঁর প্রকৃত উম্মাহ।

ভারতীয় অবতার এবং নবী-রসুলগণ

হুমায়ূন কবীর

শ্রীমদভাগবতগীতার উদ্গাতা শ্রীকৃষ্ণের সঠিক পরিচয়কে উদ্ঘাটন কোরতে গিয়ে বহু মনীষী, জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত ব্যক্তি সুগভীর গবেষণা কোরেছেন। তাদের অনেকেই অভিমত দিয়েছেন যে, আল্লাহ সকল জাতিগোষ্ঠীতে ও জনপদে ঐ এলাকার ভাষায় রচিত ধর্মগ্রন্থ সহকারে তাঁর নবী-রসুলদেরকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু ঐ নবীদের বিদায়ের পরে তাঁর শিক্ষা ও ধর্মগ্রন্থ বিকৃত কোরে ফেলা হোয়েছে। ফলে ঐ এলাকার মানুষকে নতুন কোরে পথ দেখাতে আবির্ভূত হোয়েছেন অন্য নবী যারা পূর্বের বিকৃত গ্রন্থকে রদ ঘোষণা কোরেছেন এবং নতুন বিধান জাতিকে প্রদান কোরেছেন। কেউ তাকে মেনে নিয়েছে, কেউ মেনে নেয় নি। এভাবে জন্ম হোয়েছে একাধিক ধর্মের। কালক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, এক এলাকার ধর্মের অনুসারীরা অন্য এলাকায় অন্য ভাষায় নাযেলকৃত ধর্মকে ধর্ম হিসাবে এবং ঐ ধর্মের প্রবর্তককে নবী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। যেমন ইহুদিরা ঈসা (আ:) কে আল্লাহর প্রেরিত বোলে স্বীকার করে না, খ্রিস্টানরা আখেরী নবী মোহাম্মদ (দ:)-কে নবী হিসাবে স্বীকার করে না একইভাবে মোসলেমরা ভারতীয় অঞ্চলে ভারতীয় ভাষার মানুষের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত বৌদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণ এঁদেরকে নবী হিসাবে স্বীকার করেন না। কিন্তু তাদের প্রচারিত ধর্মগ্রন্থের মধ্যে আখেরী নবীর আগমনের বহু ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখিত আছে যা গবেষণা কোরলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ঐ ধর্মগুলিও আল্লাহরই প্রেরিত (যা এখন বিকৃত হোয়ে গেছে), এবং স্বভাবতই সেগুলির প্রবক্তারা আল্লাহরই বার্তাবাহক অর্থাৎ নবী ও রসুল। এমনই একজন গবেষক ন্যাশনাল ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং ধর্মীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ইসলাম প্রচার মিশনের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ কে.এম.এ হোসাইন তার গবেষণা গ্রন্থ 'ইসলাম কি ও কেন'- তে গৌতম বুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণের নবী হওয়ার পক্ষে বিস্তারিত যুক্তি ও প্রমাণ উল্লেখ কোরেছেন। নিুলিখিত প্রবন্ধটি এমনই একটি গবেষণাকর্ম যাতে জনাব কে.এম. হোসাইনের বইসহ আরও বেশ কিছু বইয়ের সহায়তা নেওয়া হোয়েছে।

ভারতীয় অবতার শ্রীকৃষ্ণ কে ছিলেন?

শ্রীকৃষ্ণকে হিন্দু ধর্মের অবতার বলা হোলেও প্রকৃতপক্ষে হিন্দু বোলে কোনো ধর্ম বা হিন্দু শাস্ত্র বোলে কোনো শাস্ত্র পৃথিবীতে নেই। বেদ, উপনিষদ, গীতায়, পুরাণে কোথাও হিন্দু শব্দই নেই। শব্দটি এশিয়া মাইনর, খুব সম্ভব তুর্কী দেশ থেকে এসেছে সিন্ধু শব্দের অপভ্রংশ হিসাবে। উপমহাদেশে প্রচলিত এই ধর্মের প্রকৃত নাম সনাতন ধর্ম, কোর'আনে যেটাকে বলা হোয়েছে দীনুল কাইয়্যেমা, শ্বাশ্বত, চিরন্তন ধর্ম, অর্থাৎ

তওহীদ (কোরান- সূরা রুম, আয়াত ৪৩, সূরা বাইয়্যেনা, আয়াত ৫) । অবতার শব্দের অর্থ পৃথিবীতে আগমন। ঈশ্বরের অবতার বলিতে বুঝায় যে, নিখিল বিশ্বে ঐশী প্রত্যাদেশ প্রচারকারী মহামানবের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করা। সেই সময় হতেই মানবজাতি যাতে পৃথিবীতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে, মানবে মানবে হানাহানি, রক্তারক্তি, অন্যায়-অবিচার, যুলুম-অত্যাচার না করে তাই সৃষ্টিকর্তা দুনিয়াতে ধারাবাহিকভাবে নবী রসুল (অবতার, মহামানব) প্রেরণ করেছেন।

আল কোর'আন বলছে,

- প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছে রসুল (সূরা ইউনুস ৪৮)।
- প্রত্যেক জাতির জন্য হাদী বা পথ প্রদর্শক রয়েছে (সূরা রাদ ৮)।
- আমরা প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে কোনো না কোনো রসুল পাঠিয়েছি" (সূরা নাহল-৩৭)।
- এমন কোনো জাতি নেই, যার কাছে সতর্ককারী (নাযের) আগমন করে নাই (সূরা ফাতির -২৫)।

কোর'আনের এইসব বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে আল্লাহ বিভিন্ন যুগে নবী-রসুল, পথ-প্রদর্শক, সতর্ককারী ও সুসংবাদাতা পাঠিয়েছেন। মোসলেম হওয়ার শর্ত হিসাবে ঐ সব নবী-রসুলগণের উপর বিশ্বাস স্থপন করা অবশ্য জরুরি। তাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করতেও আল্লাহ নিষেধ করেছেন। মো'মেনদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেয়া হোয়েছে,

- মো'মেনরা বলে, আমরা রসুলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য কোরি না (সূরা বাকারা- ২৮৫) অর্থাৎ কোনো নবীকে মানবো, কোনো নবীকে অস্বীকার করবো তা হবে না, তারা সকলেই আল্লাহর রসুল। এ বিষয়েই আল কোর'আন বলছে,
- যারা চায় আল্লাহ এবং কতককে অস্বীকার, আর তারা চায় যেন এই দুয়ের মধ্যে একটি মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করতে। এই সমস্ত লোকেরাই হোচ্ছে পাক্কা কাফের। মো'মেন হ'ল তারা যারা আল্লাহ এবং রসুলগণের উপর ঈমান আনে এবং তাদের মধ্যে - কোনো পার্থক্য করে না (সূরা নেসা ১৫০-১৫২)।"

এইসব বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যুগে যুগে আগত সকল নবী-রসুলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা প্রতিটি মো'মেন মোসলেমের জন্য অবশ্য কর্তব্য (ফরদ) । যদি একজন নবীকেও অস্বীকার করা হয়, তবে সে ব্যক্তি "সত্যিকার কাফের" হয়ে যায় এবং পরিণাম হোচ্ছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি (সূরা বাকারা-১৫২)।

পাঠকগণ, পবিত্র কোর'আনে মাত্র ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ করা হোয়েছে। হাদিস পাঠে আমরা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বা মতান্তরে দু-লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রসুলগণের পৃথিবীতে আগমনের কথা জানতে পারি। কোর'আন বলছে-

- আমরা তোমার পূর্বেও অনেক রসুল পাঠিয়েছি, যাদের মধ্যে কারো বিষয় তোমার কাছে বর্ণনা করেছি এবং তাদের মধ্যে কারো কারো বিষয় বর্ণনা করি নাই (সূরা মো'মেন-৭৯)।

যদি সব নবীদের নাম-ধাম বৃত্তান্ত আল-কোর'আনে বর্ণনা করা হত তাহোলে একটি বিশ্বকোষের আকার ধারণ করতো। বাইবেলে বর্ণিত সকল নবীর নামও কোর'আনে উল্লেখ করা হয় নাই, আর তার প্রয়োজনও নেই। প্রত্যেক নবী-রসুলগণ তাঁদের জাতির ভাষায় তথা মাতৃভাষায় ঐশীবাণী প্রচার করেছেন, যাতে তাদের জাতির লোকেরা সহজেই নবীর শিক্ষাকে বুঝতে ও অনুসরণ করতে পারে। আর এ বিষয়েই আল-কোরআন বলছে, -

- আমরা প্রত্যেক রসুলকেই তাঁর জাতির ভাষায় পাঠিয়েছি, এই জন্য যে, যেন তাদের নিকট স্পষ্ট করে (আমার বাণী) প্রচার করতে পারে (সূরা এব্রাহীম-৫)।

এই আয়াতের মর্মবাণী হোচ্ছে, অতীতের প্রত্যেক নবী-রসুলগণ যে যে অঞ্চল ও জাতিতে আগমন করেছেন, সেই জাতি ও সেই জাতির ভাষাতেই তারা ওহী, এলহাম, দিব্যজ্ঞান, বোধি লাভ করে সেই অঞ্চলে একই ভাষা-ভাষীর মধ্যে প্রচারকার্য চালিয়েছেন। ঐসব ভাষা হিব্রু পার্শী, সংস্কৃত,পালি, চীনা বা অন্য যে কোনো ভাষাই হোক না কেন। সুতরাং অতীত জাতির নবীদের জানতে হলে আমাদের অবশ্য বিভিন্ন ভাষায় রচিত ধর্মগ্রন্থগুলি যথা 'বেদ-বেদান্ত, পুরাণ-গীতা-সংহীতা, উপনিষদ, মহাভারত, ত্রিপিটক, দিঘা-নিকায়া, জেন্দাবেস্তা, তওরাত-যবুর-ইঞ্জিল' ইত্যাদি গবেষণা ও পাঠ করে কোর'আনের আলোকে অতীত নবীদের সম্বন্ধে সত্যিকার পরিচয় জানতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনার সাপেক্ষে নিশ্চিত করে বলা যায়, ভারত উপমহাদেশেও আল্লাহ নবী-রসুল-অবতার প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের প্রচারিত বাণী-ঐশীগ্রন্থ বিকৃত

অবস্থায় হলেও ঐ জাতির মধ্যে এখনও বংশ-পরম্পরায় অনুসৃত হয়ে আসছে, তাদের ভক্ত-অনুরক্ত অনুসারীদের মাধ্যমে। এখন আমরা জানার চেষ্টা করবো যে, শ্রীকৃষ্ণ ও মহামতি গৌতম বুদ্ধ আমাদের প্রস্তাবিত উপমহাদেশের আল্লাহ প্রেরিত নবী-রসুল-অবতার ছিলেন কিনা।

এসলামী চিন্তাবিদ ও মোসলেম মনীষীদের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ

ভারতীয় মোসলেম চিন্তাবিদ ও এসলামিক দার্শনিকগণ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যেসব সুচিন্তিত মতামত রেখেছেন এবং কোর'আন হাদিসের আলোকে তাঁর সম্বন্ধে যে বক্তব্য দিয়েছেন ঐসব মতামতও বক্তব্য বিচার-বিশ্লেষণ করে এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন নবী।

- মোজাদ্দেদে আলফেসানী সরহিন্দ (রা:) কাশ্ফে প্রায় ৩০-৫০ জন ভারতীয় নবীর সমাধি দর্শন করেছেন বলে হাদীকা মাহমাদিয়া গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।
- ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত এসলামী চিন্তাবিদ ও রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব আবুল হাশিম তাঁহার বিখ্যাত "Creed of Islam" গ্রন্থে গৌতম বুদ্ধকে আল্লাহর নবী বলে তথ্যপ্রমাণ দিয়েছেন এবং নবীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত দরুদ ও সম্মানসূচক "Peace be upon him" বা আলাইহে সালাম (আ:) ব্যবহার কোরেছেন।
- খ্যাতনামা তাপস মির্জা মাজহার জানজানান এক স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং রামচন্দ্রকে নবীরূপে স্বীকার করে 'মাকামাতে মাজহারি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।
- দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম নানুতবী শ্রীকৃষ্ণ এবং রামচন্দ্রকে নবীরূপে সত্য নবী বলে স্বীকার করেছেন (মাবাহাসা শাহজাহানপুর সৎ-ধর্ম প্রচার)।
- মাওলানা জাফর আলী খান লিখেছেন, এমন কোনো জাতি বা দেশ নেই; যার দোষ-ত্রুটি সংশোধনের জন্য উপযুক্ত সময়ে আল্লাহ তা'লা কোনো নবী রসুল প্রেরণ করেন নাই। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে , শ্রীকৃষ্ণ মহান প্রভুর রেসালতের ধারায় ভারতীয় নবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (প্রতাপ, ২৮ শে আগস্ট ১৯২৯)।

- উপমহাদেশের প্রখ্যাত এসলামী চিন্তাবিদ ও মহানবী মোহাম্মদ (দ:) এর জীবনীকার "সীরাতুন্নবীর" (দ:) রচয়িতা "আল্লামা শিবলী নোমানী, ভারতীয় নবীদের সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য ভারতীয় নবীদের জীবনী ও সত্যিকার পরিচয় আজ নানারূপ কল্পকাহিনীর আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে।
- আল-কোরআনের তাফসির গ্রন্থ "তাফসীরে ওয়াহিদী"-তে মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান অকাতরে স্বীকার করেছেন যে, "শ্রীকৃষ্ণ আল্লাহর এক প্রিয় ও সৎপথ প্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। এবং নিজ যুগ ও জাতির জন্য খোদার পক্ষ হতে সতর্ককারীরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।"
- খাজা হাসান নিজামী বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশকল্পে প্রেরিত অবতার ছিলেন (কৃষণবিতি)।
- উপমহাদেশের আরও একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত, এসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা সোলেমান নদভী হিন্দুদের পূজ্য অবতার শ্রীরামচন্দ্র, কৃষ্ণ ও গৌতম বুদ্ধকে নবীরূপে স্বীকার করে তাঁর "সিরাত মোবারক" ১৯৮২ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।
- আল-কোর'আনের ব্যাখ্যাতা প্রখ্যাত তাফসিরকারক ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফতি এবং প্রখ্যাত তাফসির গ্রন্থ "মা'আরেফুল কোর'আন" এর রচয়িতা (আটখণ্ড) মুফতি মোহাম্মদ শফি, তাঁর গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে উল্লেখ করেছেন যে, আর্য ধর্মগ্রন্থ বেদের সকল ঋষিগণই নবী-অবতার ছিলেন।
- মাসিক পত্রিকা "পৃথিবীতে" মন্তব্য করা হোয়েছে যে, "গীতার শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন একেশ্বরবাদী। এই পরমপুরুষের উল্লেখ করে মহানবী বিশ্বনবী মুহাম্মদ (দ:) বলেছেন- "কানা ফিল হিন্দে নবীয়ান আসওয়াদুল লাওনা ইসমুহু কাহেন।" (হাদীসে দোলমী, তারিখে হামদান, বাবুল কাফ।) অর্থাৎ- "ভারতবর্ষে এক নবীর আবির্ভাব ঘটে, যিনি কৃষ্ণবর্ণ এবং কানাই নামে পরিচিত।" আমরা সবাই জানি যে, শ্রীকৃষ্ণের আসল নাম কানাই। আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সিফতি নাম। মাসিক পত্রিকা 'পৃথিবী' আরো উল্লেখ করেছে যে, ভারতের বৈদিকযুগ ছিল এসলামের যুগ।-(মাসিক পৃথিবী, ফেব্রুয়ারি-১৯৮৮)।
- ড. রফিক জাকারিয়া এক প্রবন্ধে বিভিন্ন মোসলেম মনীষী ও ওলামাদের উক্তি উদ্ধৃতি করে লিখেছেন যে, - According to the Quaranic declarations, not

only Moses and jesus, but all the Vedic Rishies of old and Rama, Krishna.....have alike place in the hearts of the true followers of Islam" (Ilustrated weekly of India. Dated 28.10.1973) ।

- এসলামের চতুর্থ খলিফা, জ্ঞানের দরজা নামে খ্যাত, নবী করিম (দ:) এর প্রিয়তম ভ্রাতা ও জামাতা এসলামের ইতিহাসে খ্যাতনামা সমরবিদ আলী (রা:) বলেছেন, "আল্লাহ তা'লা কৃষ্ণবর্ণের এক নবী পাঠিয়েছিলেন, যার নাম কোর'আনে উল্লেখ করা হয় নাই।" (কাশশাফ, মাদারেক) এই বর্ণনা থেকে একজন কৃষ্ণ বর্ণের নবীর আবির্ভাবের সংবাদ পাওয়া গেল, যা নবী করিম (দ:) কর্তৃক ইতোপূর্বে উল্লেখিত হাদীসের "আসওয়াদুল ও এসমুহু কাহেন" কৃষ্ণবর্ণ ও কানাই নামে ভারতীয় নবী-অবতার শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।
- ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং আরো বহু হিন্দু মোসলেম পণ্ডিত ও ভাষাবিদ সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ গবেষণা করে এমন অনেক সত্য-সনাতন বাণী খুঁজে পেয়েছেন, যার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, বৈদিক শ্লোকগুলো ঐশীবাণী এবং বৈদিক ঋষিরা নবী-অবতার, অন্তিম-ঋষি-নরাশংস, কল্কি-অবতার মহানবী মুহাম্মদ (দ:)। ঐ সব গ্রন্থের বাণী সত্য ও প্রবক্তারা সত্যবাদী না হলে তাঁদের ভবিষ্যৎবাণী কিরূপে সত্য হতে পারে?
- কবি নজরুল তাঁর মানুষ কবিতাতে লিখেছেন,

মূর্খরা সব শোনো

মানুষ এনেছে গ্রন্থ; গ্রন্থ আনে নি মানুষ কোনো।

আদম দাউদ ঈসা মুসা ইব্রাহিম মোহাম্মাদ

কৃষ্ণ বুদ্ধ নানক কবীর, বিশ্বের সম্পদ।

এখানে পবিত্র কোর'আনে যাঁদেরকে নবী বোলে সত্যায়ন করা হোয়েছে তাদের সঙ্গে একই কাতারে কৃষ্ণ ও বুদ্ধের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে, কবি নজরুল তাঁদেরকেও নবী হিসাবে বিশ্বাস কোরতেন।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনাচার ও বৈশিষ্ট্য কি বলে?

প্রাচীন যুগ হতে প্রত্যেক ধর্মে কোরবানি বা উৎসর্গের রীতি চালু আছে। কোরবানির সময় এলে শ্রীকৃষ্ণ পশু কোরবানি কোরেছেন। এর মধ্যে একটি গাভীও ছিলো (ভগবত, দশম স্কন্দ, অধ্যায়-৫৮) । এছাড়াও শ্রীকৃষ্ণের জীবনী থেকে আমরা জানি তিনি ছোটবেলায় রাখাল ছিলেন, যা এসলামের অনেক নবীর জীবনীতেও আমরা পাই। এছাড়াও তাঁর জন্মের পূর্বে তাঁর জন্মকে ঘিরে ভবিষদ্বাণীও করা হোয়েছিলো বলে জানতে পারি, যে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষিতে কংস রাজা বহু শিশু হত্যা করে। শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালন করার জন্য। মহাভারতে আছে

- "ধর্মব্যুচ্ছিতি মিচ্ছিন্তো যেই ধর্মস্য প্রবর্তকঃ অর্থাৎ- যারা ধর্মের উচ্ছেদ কামনা করে অধর্মের প্রবর্তন করে, সেই দুরাত্মাদেরকে বিনাশ করা একান্ত কর্তব্য (১২/৩৩/৩০)।
- ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম ছিল আপোষহীন। তিনি কোনো নতুন ধর্ম প্রবর্তন করতে আসেননি (ভগবত ধর্মের প্রাচীন ইতিহাস, ১ম খণ্ড ১৭২ পৃ.)। তিনি চির-সত্য, সনাতন ধর্মেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহাভারত বলছে, "সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণ সত্যমত্রা প্রতিষ্ঠিতম (মহাভারত ৫/৮৩/১২)।
- তিনি কখনো ঈশ্বরত্বের দাবী করেন নি। তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদী। ঘর-সংসার সমাজ পরিবার-পরিজন নিয়ে তিনি বসবাস করেছেন। তার পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র সবই ছিল। তিনি জন্ম-মৃত্যুর অধীন মানুষই ছিলেন। যেমন মহাভারতে বলা হোচ্ছে- "মানুষং লোকমতিষ্ঠ বাসুদেব-ইতিশ্রুত (মহাভারত ৬/৬৬/৮-৯)।
- তিনি একাধিক বিয়ে করেছিলেন। তন্মধ্যে মামাতো ও ফুফাতো বোনদের মধ্যে ভদ্রা, মিত্রবিন্দাকে বিয়ে করেছিলেন। অন্যান্য স্ত্রীদের নাম-রুক্মিনী, কালিন্দী, সত্যা, জাম্ববতী, রোহিনী, লক্ষণা, সত্যভামা, তম্বী। এক কথায় তিনি ছিলেন, "মানুষীং যোনি মস্তায় চরিষ্যতি মহিতলে (মহাভারত ৬/৬৬/১০২)। অর্থাৎ এই ধরার বুকে একজন মানুষের মত মানুষ'। তাঁর যুগের আদর্শ মানব, মহামানব।

- তিনি ছিলেন সত্য ধর্মের প্রচারক তথা বৈদিক ঋষিদের প্রচারিত ধর্মের বাহক ও প্রচারক যাহা ছিল সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের ধর্ম এসলাম। সত্য ও সত্যধর্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যেমন মহাভারত বলছে "নাস্তি সত্যাত পরোধর্ম" সত্যই ধর্ম আর ধর্মই সত্য। আর এই সত্য ধর্মের পবিত্রতা রক্ষায় শ্রীকৃষ্ণ ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেন। সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হওার পরে তিনি যুদ্ধের অনুমতি দিতেন (ভগবৎ পুরাণ ৫/১৫১/৪৫)।
- অন্যান্য নবী-রসুলদের ন্যায় তিনিও অযথা রক্তপাত, অন্যায় যুদ্ধ পছন্দ করতেন না। ভগবৎ পুরাণ দেখুন তাই বলছে : "সর্বোথা যতমানা নামযুদ্ধ ভিকাংঙ্কতাম সান্তে প্রতিহতে যুদ্ধং প্রসিদ্ধং নাপরাক্রমঃ" (ঐ ৫/৭২/৮৯)। তিনি বলেছেন, এই ধর্মযুদ্ধে নিহত হলে, "হতোবা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং স্বর্গলাভ।" অথাৎ- শহীদ ব্যক্তি স্বর্গলাভ করেন (ঐ)।
- অন্যান্য নবীদের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের আপনজন আত্মীয়রাই তাঁর প্রধান শত্রু, বিরোধী ছিলেন। (ভগবৎ ধর্মের প্রাচীন ইতিহাস পৃ-৩০০) তারা তাঁর উপর নির্যাতন করেন। উল্লেখ্য যে, মথুরার রাজা কংস বা কনিষ্কো যিনি শ্রীকৃষ্ণের আপন আত্মীয়, মামা ছিলেন। তাঁর অত্যাচারের কারণেই বাধ্য হয়ে তিনি দ্বারকায় 'হেজরত' করেন, যা অনেক নবীর ক্ষেত্রেই সংঘটিত হয়েছিল।
- অনেক ধর্মদ্রোহী শ্রীকৃষ্ণকে বেদ-বিরোধী মনে করে তাঁর বিরোধিতা করেছেন (ঐ ২০০ পৃষ্ঠা)। সত্যিকার অর্থে তিনি ঐশী-গ্রন্থ বেদের বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু পূর্ববর্তী বিকৃত বৈদিক ধর্মের পুরোহিতরা বেদ ও বেদের নামে বিকৃত প্রক্ষিপ্ত মনগড়া বাণী প্রচার করতো আর তাই তিনি এই বিকৃতধর্ম বাণীর বিরোধিতা করতেন।
- তিনি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে, ধর্ম ও অধর্মের মধ্যে প্রকৃত মীমাংসা করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন (মহাভারত ১৩/৫৮/৫-৬), যা অন্যান্য নবীদের ক্ষেত্রেও সত্য। ঐ যুগের অসুর প্রকৃতর (কাফের) মানুষরা সত্য-ধর্মের বিরোধিতা করতো এবং অসত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে তৎপর ছিল। যেমন বলা হোয়েছে, "অসত্রম প্রতিষ্ঠিংতে জগদাহুরানশ্বরম।" অর্থাৎ-সত্যধর্ম ব্যবস্থায় বিশ্বাস বা জগদীশ্বরে বিশ্বাস করতো না (গীতা-১৬/৮)।

- ধর্ম মানুষের মনুষ্যত্বের প্রমাণ। ধর্ম ছাড়া মানুষ পশুর সমতুল্য। যেমন শাস্ত্রে বলা হোয়েছে, "আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনংচ সামান্য মেতৎ পশু ভিনরানাম। ধর্মেহিতেসা মধিক বিশেষঃ ধর্মে নহীনা পশুভির্সমানাঃ।" অর্ব্থাৎ- ধর্মহীন মানুষ আর পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, উভয়েই আহার নিদ্রা, ভয় এবং যৌন কর্মের মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে।"
- অবতার শ্রীকৃষ্ণ সরল জীবন যাপন করতেন। আহার-নিদ্রা-বেশ-ভূষায় সাদাসিদা ও পবিত্র ছিলেন। তাঁর যুগের লোকেরা মদ্যপান করতো এবং পানাসক্তে এত বিভোর ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ মদ্যপানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আদেশ জারি করেন এবং মদ্য প্রস্তুত নিষিদ্ধ করেন (শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবৎ ধর্ম- ১৩৫পৃ.)।
- মহামানব শ্রীকৃষ্ণ ধর্মীয় রীতি-নীতি শাস্ত্র মতই পালন করতেন। প্রতিদিন সকালে 'ব্রহ্ম মুহূর্তে' (ফজরওয়াক্তে) শয্যা ত্যাগ করে হাত-মুখ ধৌত করতঃ (আচমন-ওজু) অজ্ঞান অন্ধকারের অতীত পরমাত্মাকে (আল্লাহকে) ধ্যান (যেক্র, প্রার্থনা, উপাসনা) করতেন। ঐ পরমাত্মা এক ও অদ্বিতীয় পরমব্রহ্ম, যিনি স্বয়ং জ্যোতি (নুর), অব্যয়-নিত্য (হাইয়্যুল কাইয়্যুম) ও নিষ্কলঙ্ক (সোবহান)। সন্ধ্যাকালে উপাসনা করতেন (বিষ্ণুভগবৎ পুরণ)। তিনি রাত্রের অর্ধযাম বাকী থাকতে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে সনাতন ব্রহ্মকে (পরম প্রভু) ধ্যান করতেন (মহাভারত-১২/৫৩/১-২)। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, 'ব্রহ্ম' অর্থ- বৃহৎ যা আরবীতে 'আকবর' বলে, মহান আল্লাহ নিজেই সাদৃশ্যহীন "বৃহৎ সত্বা"। আল্লাহ বিরাট বা মহান, যাকে মোসলেমগণ আরবীতে "আল্লাহু আকবর" বলে থাকেন।
- শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য নবী-রসুলদের মত তাঁর সদৃশ রূপবান, বলবান, বীর্যবান, সর্বশাস্ত্র কুশলীরাজ ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্ন এবং অন্যান্য মহৎগুণ সমৃদ্ধ এক পুত্র সন্তানের জন্য প্রভুর দরবারে তপস্যা করেছিলেন' (হরিবংশ-৩/৭৩)। উপরের প্রার্থনা হতে বুঝা যায় যে, সৎ পুত্র কামনা করা প্রেরিত নবী-রসুলদের চিরায়ত রীতি, যা এব্রাহীমও (আ:) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ১০১ মতান্তরে ১০৫ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন (দেশ পত্রিকা, শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৪)।

এমন প্রমাণ আরও বহু দেওয়া যাবে, কিন্তু সত্যান্বেষী মনের জন্য এটুকুই যথেষ্ট বলে আমার বিশ্বাস। আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, জন্ম-মৃত্যু, ঘর সংসার, পরিবার-পরিজন পরিচালনা, সাধনা-উপাসনা, আদর্শ সমাজ সংস্কার, সত্য-ধর্মের সেবা, প্রয়োজনে মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আদর্শে বিশ্বাসী ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত ও সবকিছু মিলিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর যুগের একজন প্রেরিত-পুরুষ, মহামানব পথ-প্রদর্শক, নবী-অবতাররূপেই আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়।

[লেখক: যামানার এমামের অনুসারী, যোগাযোগ: ০১৭৩০০১৪৩৬১]

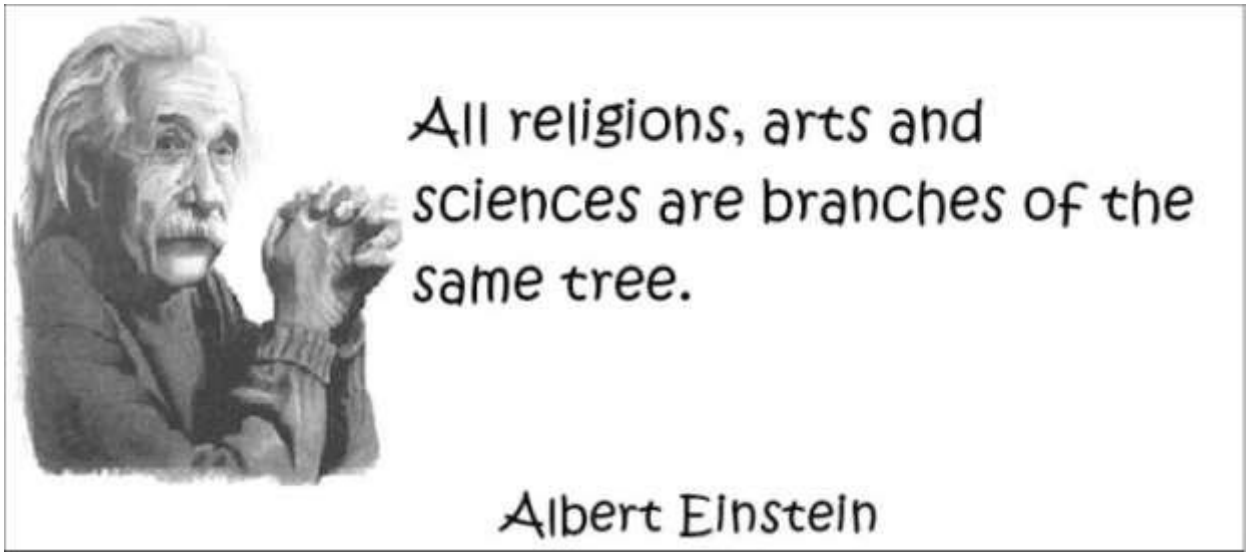

ধর্মীয় সহিংসতা থেকে মানবজাতির মুক্তির পথ

হুমায়ূন কবির

আল্লাহ সকল জাতিগোষ্ঠীতে ও জনপদে ঐ এলাকার ভাষায় রচিত ধর্মগ্রন্থ সহকারে তার নবী-রসুলদেরকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু ঐ নবীদের বিদায়ের পরে তার শিক্ষা ও ধর্মগ্রন্থ বিকৃত কোরে

ফেলা হোয়েছে। ফলে ঐ এলাকার মানুষকে নতুন কোরে পথ দেখাতে আবির্ভূত হোয়েছেন অন্য নবী যারা পূর্বের বিকৃত গ্রন্থকে রদ ঘোষণা কোরেছেন এবং নতুন বিধান জাতিকে প্রদান কোরেছেন। কেউ তাকে মেনে নিয়েছে, কেউ মেনে নেয় নি। এভাবে জন্ম হোয়েছে একাধিক ধর্মের। কালক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, এক এলাকার ধর্মের অনুসারীরা অন্য এলাকায় অন্য ভাষায় নাযেলকৃত ধর্মকে ধর্ম হিসাবে এবং ঐ ধর্মের প্রবর্তককে নবী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। যেমন ইহুদিরা ঈসা (আ:) কে আল্লাহর প্রেরিত বোলে স্বীকার করে না, খ্রিস্টানরা আখেরী নবী মোহাম্মদ (দ:)-কে নবী হিসাবে স্বীকার করেন না, একইভাবে মোসলেমরা ভারতীয় অঞ্চলে ভারতীয় ভাষার মানুষের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত বুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণ এঁদেরকে নবী হিসাবে স্বীকার করেন না। কিন্তু তাদের প্রচারিত ধর্মগ্রন্থের মধ্যে আখেরী নবীর আগমনের বহু ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখিত আছে যা গবেষণা কোরলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ঐ ধর্মগুলিও আল্লাহরই প্রেরীত (যা এখন বিকৃত হোয়ে গেছে), এবং স্বভাবতই সেগুলির প্রবক্তারা আল্লাহরই বার্তাবাহক অর্থাৎ নবী ও রসুল। এ প্রসঙ্গে গত ২৯ আগস্ট একটি প্রবন্ধ দৈনিক দেশেরপত্রে প্রকাশিত হয়। পাঠকদের কাছ থেকে এ বিষয়ে অসংখ্য ফোন পেয়েছি ও পাচ্ছি যা এ বিষয়টি নিয়ে আমাকে আরও বিস্তারিত লেখার উৎসাহ যুগিয়েছে। পাল্টা মতও দিয়েছেন অনেকে, অনেকে কিছু তথ্যবিচ্যুতি ধোরিয়ে দিয়ে উপকার কোরেছেন। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, শ্রীকৃষ্ণ,

বুদ্ধ এঁরা নবী ছিলেন এই বিষয়টি প্রকাশ করার উদ্দেশ্য কি? আমরা কি নতুন কোরে একটি ‘সাম্প্রদায়িক বিতর্কের’ জন্ম দিচ্ছি? এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য পাঠকদের জানা প্রয়োজন।

প্রথম কথা হোল, এই উপমহাদেশসহ বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখি এক ধর্মের অনুসারীদের অজ্ঞতা এবং ভুল জানার কারণে তারা এক ধর্মের অবতারদেরকে, মহাপুরুষদেরকে আরেক ধর্মের ধর্ম গুরুরা, ধর্ম ব্যবসায়ীরা অসম্মান করেন, অপমান করেন, গালাগালি করেন। এটা দুনিয়াময় ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বীজ। **আমরা বিশ্বাস কোরি প্রত্যেক ধর্মের মানুষ যদি অন্য ধর্মের প্রভু এবং অবতারদের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারে তারা দেখবে যে তারা সকলেই এক স্রষ্টার থেকে আগত, তাদের ধর্মগুলিও সেই প্রভুরই অবতারিত, এবং সকল ধর্মের অবতারগণ মানুষের কল্যাণার্থেই এসেছিলেন। এই সত্য জানতে পারলে প্রত্যেকেই সেই অভিন্ন স্রষ্টার অবতারদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি পোষণ কোরবে, তখন সকল ধর্মের অনুসারীদের হৃদয় থেকে অন্যদের প্রতি বিদ্বেষভাব বিদূরিত হোতে বাধ্য। এভাবে সাম্প্রদায়িকতার অপচর্চা চিরতরে বন্ধ হোয়ে যাবে।** একটি উদাহরণ: ইউরোপে খ্রিস্টানরা যে ইহুদিদের উপরে হামলা চালিয়ে গত ১৯০০ বছর ধোরে লক্ষ লক্ষ ইহুদি হত্যা কোরেছে, তাদেরকে বিতাড়িত কোরেছে এ সবকিছুর গোড়ায় কারণ ছিল ইহুদিরা ঈসা (আ:)-কে জারজ সন্তান এবং মা মরিয়মকে ভ্রষ্টা বোলে অপবাদ দিয়ে থাকে (নাউযুবেল্লাহ), এবং খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে যে ইহুদিরা ঈসা (আ:)-কে ক্রুশবিদ্ধ কোরে হত্যা কোরেছে। ইহুদিরা এখনও যদি এই বিশ্বাসে উপনীত হয় যে, ঈসা (আ:) মুসার (আ:) মতই আল্লাহর নবী ছিলেন, তারা নিশ্চয়ই আর তাঁকে ‘জারজ সন্তান’ বোলে গালি দিতে পারবে না। একইভাবে হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধরা শেষ নবী, বিশ্বনবী মোহাম্মদ (দ:) কে নবী হিসাবে অস্বীকার করে। তাদের অনেকে এতটাই এসলাম-বিদ্বেষী যে কার্টুন, চলচ্চিত্র, সাহিত্য, চিত্রকলা দিয়ে প্রায়ই এসলামের নবীকে এবং পবিত্র কোর’আনকে অবমাননা কোরে চোলছে যার ফলে অসংখ্য দাঙ্গায় প্রাণহানী, রক্তপাত ঘোটেছে, আজও সেই আগুন জ্বলে যাচ্ছে কোটি এসলামপ্রিয় মানুষের হৃদয়ে। কিন্তু গত ১৪০০ বছরে একজন মোসলেমও ঈসা (আ:)-কে নিয়ে কোনো কটূক্তি কোরেছে বোলে কেউ দেখাতে পারবে না। কিন্তু হিন্দুধর্মের যাঁরা অবতার তাদের ব্যাপারে মোসলেমদের সঠিক জ্ঞান নেই। ফলে তাদের অনেকেই বিভিন্ন সময়ে সেই মহামানবদের হেয় কোরে কথা বোলেছে, হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় অনুভূতিতে

আঘাত দিয়েছে। এই কাজটি হিন্দুরাও কোরেছে- যেখানে যে সংখ্যাগুরু সেই সেখানে সংখ্যালঘুদের উপরে আক্রমণ কোরেছে, তাদের উপাসনালয় ধ্বংস কোরেছে। এই কারণে আমরা চাই ভারতীয় নবীদের সঠিক পরিচয় মানুষের সামনে তুলে ধোরতে।

দ্বিতীয় কারণ হোচ্ছে, সমস্ত দুনিয়ায় অন্যায় অবিচার অশান্তির মূল হোচ্ছে ইহুদি-খ্রিস্টান 'সভ্যতা'। আত্মাহীন, স্রষ্টাহীন, নৈতিকতাহীন, দেহসর্বস্ব এই বস্তুবাদী সভ্যতাকে সব ধর্মের লোকেরাই অবলীলায় গ্রহণ কোরে নিয়েছেন এবং দাজ্জালের সংস্কৃতি গোগ্রাসে গিলছেন। তাদের উচিত ছিল তাদের সামষ্টিক জীবন পরিচালনা করার জন্য জীবনবিধান দিতে যে মহামানবদেরকে স্রষ্টা আল্লাহ পাঠিয়েছেন, সেই অবতারের শিক্ষা তাদের গ্রহণ করা। তা না কোরে সবাই যার যার ধর্মীয় শিক্ষাটাকে ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ কোরে রেখেছেন। কেউ মন্দিরের মধ্যে ঢুকিয়েছেন, কেউ মসজিদে ঢুকিয়েছেন, কেউ প্যাগোডায় ঢুকিয়েছেন, কেউ ঢুকিয়েছেন গির্জায়, আর ঐ সমস্ত উপাসনালয়ে বোসে প্রত্যেক ধর্মের ধর্মজীবীরা ধর্মকে নিয়ে ব্যবসা কোরে খাচ্ছেন। তারা তাদের অবতারদের শিক্ষাকে গ্রহণ করেন নি, সাধারণ মানুষকেও সঠিক শিক্ষা দেয় নি। ফলে সাধারণ মানুষ চিরকালই ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকেছে, এখনও বঞ্চিতই আছে। তারা যদি তাদের সেই অবতারদের প্রকৃত শিক্ষাকে গ্রহণ কোরে নেয় তাহোলে মানুষ সত্যিই মুক্তি পাবে। তারা যদি প্রত্যেকে সত্যসন্ধানী মন নিয়ে তাদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থগুলি অভিনিবেশ সহকারে প্রণিধান করে তবে তারা বুঝতে পারবে যে, তাদের ধর্মের ধারাবাহিকতাই হোচ্ছে এসলাম নামক দীনটি। বিশ্বধর্মগুলির ধর্মীয় গ্রন্থাদিতে যে ভবিষ্যদ্বাণী উৎকলিত আছে সেখানেও এই শেষ এসলামের এবং শেষ নবীর উল্লেখ রোয়েছে। তাদের অবতারগণ এই শেষ নবীর অনুসারী হওয়ার জন্য নিজ জাতিকে হুকুম দিয়ে গেছেন। অন্য ধর্মের অনুসারীরা যদি শেষ ধর্মগ্রন্থ কোর'আন পাঠ করে এবং এর বক্তব্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে সম্পর্কে চিন্তা করে তাহোলে খুব সহজেই তারা বুঝতে সক্ষম হবেন যে কোর'আন একটি ঐশীগ্রন্থ। সুতরাং মানবজাতির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে বড় একটি বাধা অপসারিত হবে। সমস্ত পৃথিবী যেভাবে অন্যায়, অবিচারে পূর্ণ হোয়ে আছে, এই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য সকলে মিলে একটি জাতিতে পরিণত হোতে হবে। এই যে একজাতি হবে

সেটার জন্য একটি ঐক্যসূত্র লাগবে। সেই ঐক্যসূত্র হোল স্রষ্টা, ইশ্বর, আল্লাহর প্রেরিত শাস্ত্রগ্রন্থ আল কোর'আন। এই কোর'আনকে মেনে নেওয়ার জন্য সকল ধর্মগ্রন্থাদিতে নির্দেশ দেওয়া আছে। এখানে আমরা ভারতীয় নবীদের কথা বোলতে পারি। সনাতন ধর্মের বহু ধর্মগ্রন্থে বিভিন্ন নামে শেষ নবীর উল্লেখ রোয়েছে, যেগুলিতে শেষ নবীর জীবনের বহু ঘটনার বিবরণ ও লক্ষণ তুলে ধরা হোয়েছে যা দিয়ে কোনো সুস্থজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ এসলামকে সত্যদীন বোলে স্বীকার কোরতে বাধ্য হবেন। বেদে পুরানে শেষ নবীকে কোথাও বলা হোয়েছে কল্কি অবতার, কোথাও নরাশংস, কোথাও অন্তিম ঋষি, বৌদ্ধ ধর্মে তাঁকেই বলা হোয়েছে মৈত্তেয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত পরবর্তীতে লেখার আশা রাখি। এ বিষয়গুলি সম্পর্কে জনসাধারণ বিশদভাবে অবগত নন, কারণ সকল ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেই একটি পুরোহিত শ্রেণি জন্ম নিয়েছে যারা ধর্মকে নিজেদের কুক্ষিগত কোরে রেখেছে। তারা ধর্মের ইজারা নিয়ে সাধারণ মানুষকে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কোরে রেখেছে। কিন্তু সত্য উদ্ঘাটনের জন্য প্রত্যেক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের উচিৎ নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। তাহোলে বিকৃতির ঘন অন্ধকারের মধ্যেও কিছু মহাসত্যের আলোকচ্ছটা অবশ্যই তাদের দৃষ্টিগোচর হবে। এই সত্যসন্ধানে সাহায্য করার জন্য সেই ধর্মগ্রন্থের উক্তিগুলি পাঠকের সামনে আমরা তুলে ধোরছি। সুতরাং প্রত্যেকের প্রথম করণীয় হোচ্ছে নিজ ধর্মের অবতারদের নির্দেশ মান্য কোরে তাঁরা আখেরী যুগে (কলিযুগে, Last Hour) যে অবতার ১৪০০ বছর আগেই আগমন কোরেছেন সেই নবী মোহাম্মদ (দ:) এর অনুসারী হওয়া। যদি নিজ ধর্মের অবতারদেরকে তারা সম্মান কোরেই থাকেন তাঁর নসিহত অবশ্যই তাকে শুনতে হবে।

সুতরাং ভারতীয় নবীদের প্রকৃত পরিচয় ধর্মগ্রন্থ ও ইতিহাসের গহ্বর থেকে তুলে এনে তাঁদেরকে সঠিক স্বীকৃতি দিয়েছেন এ যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। আবারও বোলছি, আমরা তাদের সঠিক পরিচয় তুলে ধোরছি প্রধানত দু'টি উদ্দেশ্যে, (এক) অন্য ধর্মের অবতাররাও যে একই স্রষ্টার প্রেরিত নবী ও রসুল এই সত্য না জানার কারণে মানুষ তাঁদেরকে অশ্রদ্ধা ও অবমাননা করে এবং তাঁদের ব্যাপারে কটূক্তি করে, এটা সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও হিংসাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রত্যেক মানুষই একই বাবা মায়ের সন্তান, তাদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ একই ধর্ম পাঠিয়েছেন। স্থান-কাল-পাত্রভেদে কিছু বিধানের পার্থক্য থাকলেও সকল ধর্মের মর্মবাণী ছিল এক - আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, লক্ষ্য ছিল এক - শান্তি, এবং ধর্মগুলির প্রবর্তকেরা

সবাই ছিলেন এক স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রেরিত। এই সত্য মেনে নিলে ধর্মীয় সহিংসতার ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কোনো সুযোগ থাকবে না।

(দুই) সকল ধর্মের মানুষের উচিৎ নিজেদের ধর্মের অবতারদের নির্দেশ মোতাবেক শেষ রসুলের (দ:) আনীত সিস্টেম গ্রহণ কোরে নেওয়া। আমরা জানি, আপনাদের ধর্মগুলিতে জাতীয় জীবন পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন-কানুন নেই, যে বিধানগুলি আপনাদের ধর্মে আছে সেগুলিও কালপরিক্রমায় বিকৃত হোয়ে গেছে। সুতরাং ইচ্ছা কোরলেও আপনাদের ধর্মগুলি দিয়ে জাতীয় জীবন চালাতে পারবেন না। সেজন্যই ইহুদি খ্রিস্টান বস্তুবাদী 'সভ্যতা'র গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ইত্যাদি তন্ত্র-মন্ত্রের শরণাপন্ন আপনারা হোয়েছেন। তার পরিণামও দেখতে পাচ্ছেন, বিশ্বজুড়ে জ্বলছে অশান্তির আগুন। কিন্তু আল্লাহ তাঁর শেষ প্রেরিতের মাধ্যমে যে জীবনব্যবস্থাটি দান কোরেছেন এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আধ্যাত্মিক সকল প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম এই দীন। বৈদিক যুগে শাস্ত্র দিয়ে রাজারা রাজ্যশাসন কোরতেন, তখন মানুষ তো বটেই একটি কুকুরের উপরও অন্যায় করা হোত না। সেটা ছিল সত্যযুগ, যার বর্ণনা আপনাদের ধর্মগ্রন্থাদিতে আছে। ইহুদিরা যখন তওরাতের বিধান দিয়ে জীবন চালাতো তখন তারা সর্বদিকে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হোয়েছিল। একইভাবে অর্ধ-পৃথিবীতে যখন আল্লাহর শেষ এসলাম প্রতিষ্ঠিত হোল, সেখানেও প্রতিষ্ঠিত হোল এমন শান্তি ও নিরাপত্তা যে মাসের পর মাস আদালতে অপরাধ সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ আসতো না, মানুষ অর্থনৈতিকভাবে এতটাই স্বচ্ছল হোয়ে গিয়েছিল যে, মানুষ টাকা নিয়ে গরিব মানুষের সন্ধানে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো, কিন্তু সেই অর্থ গ্রহণ করার মত কোনো লোক খুঁজে পেত না। সেই শান্তি আবারও আসবে যদি মানবজাতি আবারও আল্লাহর দেওয়া এই সিস্টেম গ্রহণ কোরে নেয়। তাহোলেই প্রচলিত হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা হবেন সনাতন ধর্মের সত্যিকার অনুসারী, আর বিকৃত এসলাম ধর্মের অনুসারীরা হবেন সত্যিকার মোসলেম।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রাজনৈতিক হাতিয়ার

হুমায়ূন কবির

ভারতে কিছুদিন আগেই হোয়ে গেল হিন্দু মোসলেম দাঙ্গা। উত্তর প্রদেশের মোজাফফরবাদে সংঘটিত এ দাঙ্গায় ৩৭ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হোয়েছে। ২০১৩ এর প্রথম নয় মাসে ১০৭ জন মানুষ ভারতে দাঙ্গায় মর্মান্তিক মৃত্যুবরণ কোরেছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মানব ইতিহাসের একটি অবিচ্ছেদ্য কলঙ্কজনক অধ্যায়। ধর্মের নামে উন্মাদনা একটি অধর্মীয় কাজ যা আল্লাহ ও রসুলের বাঞ্ছিত নয়। আল্লাহর রসুলের প্রকৃত উম্মাহ এসে যেখানে আল্লাহর প্রেরিত শেষ জীবনব্যবস্থা এসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিল সেখানেই সৃষ্টি হয়েছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। ভারত উপমহাদেশে এসলাম প্রবেশ করে ১৩০০ বছর আগে। মোহাম্মদ বিন কাসেম হিন্দু ও বৌদ্ধদেরকে আহলে কেতাব হিসাবে স্বীকৃতি দেন। ফলে হিন্দু ও মোসলেমের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব হয়। তবে ভারতের সর্বত্র এসলাম বিস্তার লাভ করে প্রায় এক হাজার বছর আগে। যে এসলামটি ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয় সেটা প্রকৃত এসলাম ছিল না। যে কোনো জীবনব্যবস্থাই চারশ' বছরে তার মূল রূপ হারিয়ে ফেলবে, এটাই স্বাভাবিক। তবু এসলামের যে শিক্ষাগুলি তখনও অবশিষ্ট ছিল তার প্রভাবে ১০০০ বছরের মোসলেম শাসনামলে উল্লেখযোগ্য কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইতিহাস নেই। হিন্দু-মোসলেম এর মধ্যে শত্রুতার সম্পর্ক তৈরি হোয়েছে মূলত ব্রিটিশ শাসনামলে। সভ্য ভাষায় তারা এই নীতিকে বলে "ডিভাইড এন্ড রুল" নীতি। এটাই ভারত উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িতকতার সূতিকাগার। মাত্র কিছুদিন আগে প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার সভাপতি ও সাবেক বিচারপতি মার্কেন্ডি কাতজু বোললেন, ১৮৫৭ পর্যন্ত ভারতে সাম্প্রদায়িকতা বোলতে গেলে ছিলই না। হিন্দু ও মোসলেমের মধ্যে পার্থক্য ছিল বটে, কিন্তু শত্রুতার সম্পর্ক ছিল না। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও হিন্দু ও মোসলেম একতাবদ্ধভাবে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। বিদ্রোহ দমনের পরে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দেরকে ঐক্যহীন করার জন্য Divide and Rule নীতি গ্রহণ করেন।" ভারতে প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটে ১৯২১-২২ সনে দক্ষিণ মালাবার এলাকায়। ব্রিটিশরা ১৯৪৭ এ এই উপমহাদেশকে আপাতঃ স্বাধীন করে চোলে গেলেও যাওয়ার আগে ধর্মের ভিত্তিতে পাক-

ভারতকে ভেঙ্গে ভাগ ভাগ করে রেখে যায় যে ভাগগুলি বিগত বছরগুলিতে নিজেদের মধ্যে বহু যুদ্ধ করেছে এবং আজও একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত। সরকারী হিসাবমতে দেশবিভাগের পর থেকে আজ পর্যন্ত কেবল কাশ্মীরেই গৃহহীন হোয়েছে ২ লক্ষ পরিবার। নিহত হোয়েছে হাজার হাজার, ধর্ষিতার কোনো শুমারি নেই। এমনকি আমাদের দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পেছনেও সাম্প্রদায়িক চেতনা বেশ শক্তিশালীভাবে ক্রিয়াশীল ছিল এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

আজও ভারতসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই কিছু না কিছু সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ঘটে চলেছে। এ সহিংসতা থেকে মুক্তির পথও আল্লাহ দেখিয়ে দিয়েছেন। আমরা যদি সেই পথে না গিয়ে ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্রমূলক Divide and Rule নীতির কুফলকে ললাট-লিখন হিসাবে মেনে নেই, তাহলে এই দাঙ্গা কোনদিনই বন্ধ হবে না। আর্মি, পুলিস দিয়ে পিটিয়ে একে নির্মূল করা যাবে না। কারণ এক ধর্মের অনুসারীরা সুযোগ পেলেই অন্য ধর্মের বিধাতা ও ধর্মপ্রবর্তকদেরকে গালি দিয়ে, কার্টুন এঁকে, সিনেমা বানিয়ে ঘৃণা বিস্তার করেন। ফলে নিভু নিভু আগুন আবার জ্বলে ওঠে। তারচেয়ে বড় কথা এই দাঙ্গা এখন যতটা না সাম্প্রদায়িক, তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক। ব্রিটিশরা যেমন তাদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মকে ব্যবহার করেছে, ষড়যন্ত্র করে হিন্দু ও মোসলেমের রক্ত ঝরিয়েছে, আজও ঠিক সেভাবেই তাদের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার এতদঅঞ্চলের গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী নেতানেত্রীরা ধর্মকে ব্যবহার করে ভোটযুদ্ধে জয়ী হবার চেষ্টা করেন। দেরিতে হলেও ভারত সরকার এই সত্যটি উপলব্ধি কোরে দাঙ্গা চলাকালে কোনও দলের কোনও নেতাকেই মোজাফফরবাদের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেয় নি। রাজ্য সরকারের পুলিশ মুজফফরাবাদে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য যে এফআইআর করেছে, তাতে রয়েছে একাধিক বিজেপি বিধায়কের নাম। সুতরাং দাঙ্গার রাজনীতির মধ্যে ভোটের রাজনীতি যে মিশে যাচ্ছেই তা অস্বীকার করতে পারছেন না কেউই।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বড় উদাহরণ রুয়ান্ডা, মায়ানমার, চীন, থাইল্যান্ড ইত্যাদি। প্রতিটি দেশেই তলিয়ে দেখলে এই একটি সত্য প্রতীয়মান হয়। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকারী বহু-সাম্প্রদায়িক একটি সমাজ কী কারণে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অবতীর্ণ হয় এবং কিভাবে সাম্প্রদায়িকতা অনস্তিত্ব থেকে

এসে একেবারে সমাজের প্রধান প্রভাববিস্তারকারী দ্বন্দ্ব হিসাবে আবির্ভূত হয় সেটা বিশ্লেষণ করে যুদ্ধ গবেষক Lutz F. Krebs তার Ethnicity, Political Leaders and Violence প্রবন্ধে সুস্পষ্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়েছেন যে, Elites play an evident role in promoting conflict অর্থাৎ সমাজের উঁচু শ্রেণি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পৃষ্ঠপোষণ ও উত্তেজনা প্রবর্ধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আজ থেকে প্রায় এক বছর আগে বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল মায়ানমার মোসলেম গণহত্যা প্রসঙ্গে একটি প্রতিবেদন। সেখানে মিয়ানমার বিষয়ক বিশিষ্ট রাজনৈতিক ভাষ্যকার লিন দিন এর বরাত দিয়ে বলা হয়, "সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে মিয়ানমারের বিরোধীদলীয় নেত্রী শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অং সান সু চি রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর গণহত্যার ব্যাপারে কোনো কথা বলছেন না। নির্বাচনে বৌদ্ধদের ভোট পাওয়ার আশায় রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে নীরব রয়েছেন তিনি।" অথচ ঐ মুহূর্তে দাঙ্গার কারণে প্রায় এক লাখ রোহিঙ্গা মুসলমান আশ্রয় শিবিরে, খোলা আকাশের নিচে, বন-জঙ্গলে কিংবা নৌকায় ভাসমান অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছেন।

মোসলেম দাবিদার রোহিঙ্গাদের গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে ফিরে আসছে বৌদ্ধ যুবকেরা।

আমাদের দেশেও গত ৪০ বছরে যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষগুলি হোয়েছে তার প্রায় সবগুলিই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের ইন্ধনে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় হোয়েছে। কেউ ভোটের জন্য, কেউ ইস্যু সৃষ্টি করে আন্দোলনের মাঠ গরম করার জন্য এই সংঘর্ষগুলি বাঁধিয়েছে। ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান মজিনা রামুর বৌদ্ধমন্দির ধ্বংসের ঘটনার প্রসঙ্গে বলেন, রামুর ঘটনা ধর্ম নিয়ে ঘটে নি। ঐদিন আমাদের দেশের প্রায় সব জাতীয় পত্রিকায় এ খবরটি এসেছে। কোনো ধর্মেই অন্য ধর্মের অনুসারীদেরকে আক্রমণ করার, তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা বিস্তার করার জন্য অনুমতি দেয় না। তাই ধর্মের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে কোনো পক্ষ এই দাঙ্গা বাধিয়েছে এমন ধারণা অবান্তর।

যে ক'টি উদাহরণ এখানে দিলাম আশা করি উন্মুক্ত মনের পাঠকের বোঝার জন্য সেগুলি যথেষ্ট হবে। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অবসানকল্পে কত শত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান কাজ করছে, বাণী দিচ্ছেন জাতিসংঘের মহাসচিব থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ, মায়াকান্না করছে ধর্মগুরুরা, মোনাজাত করা হোচ্ছে মসজিদে, মাহফিলে, এস্তেমায় আর হজে। তবু অসহায় গৃহহীন আর স্বজনহারা মানুষের কান্নার ধ্বনী তীব্র থেকে তীব্রতর হোচ্ছে। অথচ এই সমস্যার সমাধান আল্লাহ দিয়ে রেখেছেন ১৪০০ বছর আগেই। আমাদের উপমহাদেশের কথাই বলি। ভারতের ১০০০ বছরের মোসলেম শাসনের ইতিহাস মানুষকে এই শিক্ষাই দিচ্ছে। প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী যত যুদ্ধ করেছিল সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করে সেখানে আল্লাহর বিধান জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু তারা ব্যক্তিগতভাবে একটি মানুষকেও তার ধর্ম ত্যাগ করে এই দীন গ্রহণে বাধ্য করেন নি। যেখানেই তারা আল্লাহর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন সেখানেই অন্য ধর্মের চার্চ, সিনাগগ, মন্দির ও প্যাগোডা রক্ষার দায়িত্ব তো নিয়েছেনই তার উপর ঐ সব ধর্মের লোকজনের যার যার ধর্ম পালনে কেউ যেন কোনো অসুবিধা পর্যন্ত না করতে পারে সে দায়িত্বও তারা নিয়েছেন। ভারতবর্ষে এই দীর্ঘ সময়ে যদি হিন্দুদেরকে ধর্মান্তরকরণে বাধ্য করা হতো, ভারতবর্ষে একটি হিন্দু পরিবারেরও থাকার কথা ছিল না (অবশ্য শেষ দিকে কিছু রাজা, নবাবরা বিভিন্ন এলাকায় হিন্দুদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছে, কিন্তু এগুলি ছিল বিচ্ছিন্ন ঘটনা যা মোসলেম জাতির আদর্শচ্যুতির পরিণাম)। কিন্তু বাস্তবে ভারতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা মোসলেমের বহুগুণ বেশী। এসলামের স্বর্ণযুগে মধ্যপ্রাচ্যসহ অর্ধ-পৃথিবী জুড়ে মোসলেম শাসিত

এলাকায় ইহুদি-খ্রিস্টানসহ অন্যান্য ধর্মের লক্ষ লক্ষ মানুষের বাস ছিল। যদি মোসলেমরা কাউকে ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য বাধ্য করত, তবে আজকের ইসরাইলে, সিরিয়া, লেবানন, মিশরে, উত্তর আফ্রিকার দেশগুলিতে অন্যধর্মের কোনো লোকই থাকতো না। সুতরাং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধকল্পে সর্বাগ্রে প্রয়োজন এই সচেতনতা সৃষ্টি করা যে, প্রতিটি ধর্মই এক স্রষ্টা থেকেই আগত, যেমন প্রতিটি মানুষ একই বাবা-মায়ের সন্তান, স্বভাবতঃই সকল ধর্মের অবতারগণও সেই একক স্রষ্টারই প্রেরিত। এই সত্য যে জানবে সে কি পারবে অপর ধর্মের নবী-রসুল-অবতারগণকে গালি দিতে? সুতরাং মানুষ যদি সত্যিই চায় এই সমস্যার সমাধান করতে, তবে তার পদ্ধতি আল্লাহ দিয়েছেন, আমরা সেটা পেশ করছি। এটা যদি মানুষ গ্রহণ না করে তবে এই অন্যায়, অশান্তিই তাদের জন্য প্রচলিত জীবনব্যবস্থার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

[লেখক: যামানার এমামের অনুসারী, যোগাযোগ: ০১৭৩০০১৪৩৬১]

ইউরোপের ললাটে দুঃশ্চিন্তার বলিরেখা – মো: রিয়াদুল হাসান

টাকা দিয়ে সুখ কেনা গেল না

খবরে প্রকাশ, নরওয়ের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী কোষাগারে বর্তমানে জমা আছে ৭৫ হাজার কোটি মার্কিন ডলার যা বাংলাদেশী টাকায় হয় প্রায় ৬০০,০০,০০,০০,০০,০০০ (ষাট লক্ষ কোটি টাকা), মাথা পিছু অর্থের পরিমাণ হিসাব করলে দাঁড়ায় ১৪ লাখ ৫ হাজার ডলার, বাংলাদেশী টাকায় ১১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা করে। প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি অর্থ ও সম্পদ থাকায় স্ক্যান্ডেনেভিয়ান অঞ্চলের এ রাষ্ট্রের নাগরিকরা বিব্রত বোধ করছেন (দৈনিক আমাদের সময়, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৩)। দেশটির এত বেশি পরিমাণ অর্থ কিভাবে খরচ করবেন এই নিয়ে দুঃচিন্তায়

বিভোর দেশটির প্রশাসন। আরবীয় তেল সমৃদ্ধ দেশগুলির একটি বিশেষ শ্রেণির মানুষেরও একই অবস্থা। সম্পদ রাখার জায়গা নেই, খরচের উপায় চিন্তা করে গলদঘর্ম হচ্ছেন। পৃথিবীতে প্রতিদিন এ বিলিয়ন মানুষ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে এ পরিসংখ্যান তাদের কাছে কেবলই কতগুলি নির্বিকার সংখ্যা। আরবরা না হয় তেল সম্পদে তৈলাক্ত, কিন্তু ইউরোপের মানুষ এত ধনী কিভাবে। সে ইতিহাস সকলের জানা। যে বিপুল সম্পদের পাহাড়ে বসে আজ তারা তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে সেই সম্পদ প্রকৃতপক্ষে লুটের সম্পদ। কয়েক শ' বছর ধরে ভারত উপমহাদেশসহ প্রাচ্য, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার সমৃদ্ধ দেশগুলিকে শোষণ কোরে ইউরোপিয়রা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। এদেশের চাষীদের ধানক্ষেতকে নীলক্ষেতে রূপন্তরিত করে ভারতের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যাকে মন্বন্তরের শিকারে পরিণত করে হত্যা করেছে। প্রাচ্যের শিল্প সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিয়ে নিজেরা এখানকার কাঁচামাল দিয়ে পণ্য উৎপাদন করে এ দেশের মানুষের কাছে চড়া মূল্যে বিক্রী করেছে। এসব ইতিহাস কি মানুষ ভুলে গেছে। সেই ইউরোপীয়রা আজও তাদের সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির (যেমন নরওয়ের টেলিনর) মাধ্যমে প্রতি মুহূর্তে করে যাচ্ছে পদ্ধতিগত ডাকাতি (Systamic Robbary)। এভাবে বিভিন্ন সিস্টেমের মাধ্যমে পৃথিবীর সম্পদ তাদের কাছে গিয়ে জমা হচ্ছে। আর বঞ্চিত হচ্ছে বাকী পৃথিবী। যেহেতু পৃথিবীর মোট সম্পদ নির্দিষ্ট পরিমাণ, তাই এক জায়গায় যখন অধিক সম্পদ স্তুপীকৃত হয়, তখন অন্যত্র টান পড়ে। এই ভাটার টানে পৃথিবীর এক অংশের মানুষ হয়ে যায় তৃতীয় বিশ্বের বাসিন্দা।

এ বৈষম্য ইউরোপের মধ্যেও দুঃখজনক রূপ পরিগ্রহ করেছে, যদিও তাদের অবস্থা এশিয়া, আফ্রিকার দরিদ্র দেশগুলির থেকে শতগুণ ভাল। বিপুল অর্থ বৈভব নিয়ে নিশীথ সূর্যের দেশটির অধিবাসী ও সরকার যখন চিন্তায় অস্থির তখন পৃথিবীর অন্যপ্রান্ত অর্থাৎ এশিয়া বা আফ্রিকার কঙ্কালসার মানুষদের কথা বাদই দিলাম, খোদ ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের অবস্থা লক্ষ্য করুন। অর্থনৈতিক মন্দার শিকার ব্রিটেনে চলছে ব্যয় সংকোচনের প্রতিযোগিতা। সেনা সংখ্যাও কমাতে হয়েছে ব্যয় সংকোচনের স্বার্থে। খোদ যুক্তরাষ্ট্রেও হাজার হাজার সরকারী চাকুরীজীবী বেকার হয়ে পড়ছে। অকুপাই ওয়াল স্ট্রীট আন্দোলনের দৃশ্যপট এখনও বিশ্ববাসীর স্মৃতিপটে জাগরুক। আরও বহু দেশে জ্বলে উঠেছিল বিদ্রোহের বহ্নিশিখা- আমরা ৯৯% বঞ্চিত। ইউরোপের আরেক রাষ্ট্র

গ্রীসের অবস্থা রীতিমত ভয়াবহ। যেন দেশ বিক্রি করতে যাচ্ছে রাষ্ট্র। ইতিমধ্যে কয়েকটি দ্বীপ আরবদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে অর্থের যোগান দেওয়ার প্রয়োজনে। ফ্রান্স, স্পেন এবং ইতালিতেও চলছে ব্যয় সংকোচন ও কর্মী ছাটাই, বেতন দিতে না পেরে বিদেশী শ্রমিকদেরকে পাঠিয়ে দিচ্ছে মাতৃভূমিতে। ইদানিং দেখা যাচ্ছে বঞ্চিত জনসংখ্যার মাঝে যখন বিক্ষোভ শুরু হয় তখন মুহূর্তেই সেখানে ৩/৪ লাখ লোক একত্রিত হয়ে যায়। সেই বিক্ষোভ সেই দেশের বড় বড় শহর তো বটেই আশ পাশের দেশগুলিতেও দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। এই বিক্ষোভে সরকারপক্ষ একটু বাধা দিলেই শুরু হয় ভয়াবহ দাঙ্গা, রায়ট। মানুষের মনের ভিতরে যে প্রচণ্ড ক্ষোভ সঞ্চিত আছে সেটা বিস্ফোরণের আকারে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। মাত্র কিছুদিন আগে খোদ লন্ডনে এমন একটি দাঙ্গা অগ্নিকাণ্ডের রূপ নেয়, দোকান পাট, শপিং মল ভাঙচুর লুট পাটের সেই দৃশ্য পৃথিবীবাসী টেলিভিশনের পর্দায় দেখে আতঙ্কিত হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কঠোর হস্তে এই গণবিদ্রোহের আগুন নির্বাপিত করে। কিন্তু কাউকে ভুললে চলবে না যে, গোটা মানবজাতিই এখন অগ্নিগর্ভ হয়ে আছে। কেবল পেশিশক্তি দিয়ে একে আজীবন নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে না। সমাজের মধ্যে যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এবং জীবনের সর্ব অঙ্গনে যে অবিচার, বৈষম্য ও অন্যায়ের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে তথাকথিত গণতান্ত্রিক সিস্টেমের মাধ্যমে, এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষ যে কোন সময়ে ফেটে পড়বে। এই অনিবার্য পরিণতি বোঝার জন্য সমাজবিজ্ঞানী হতে হয় না। এখন প্রশ্ন হল, এক রাষ্ট্রে দুধের নহর বয়ে যাচ্ছে, অর্থের বন্যায় ভাসছে অর্থ কিভাবে কোনপথে ব্যয় করবে সেই পথ খুঁজে পাচ্ছে না অথচ তারই পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলো অর্থাভাবে চরম দৈন্য দশায় পড়ে রাষ্ট্রের ভূখণ্ড বিক্রি করছে। কিনে নিচ্ছে আরবীয় আমীর ওমরাহ, তেলব্যবসায়ীরা। কেন এই অবস্থা?

এই অবস্থার প্রকৃত কারণ হচ্ছে, স্রষ্টা পৃথিবী সৃষ্টি করে মানুষ প্রেরণ করেছেন পৃথিবীতে সকলে মিলে শান্তিতে বসবাস করার জন্য অথচ পৃথিবীর মানুষ এই পৃথিবীকে সীমানা দাগ কেটে টুকরো টুকরো করেছে। এর অনিবার্য ফল হয়েছে আজকের নরওয়ে, সুইজারল্যান্ডের নাগরিকরা যারা সম্পদের, অর্থের আধিক্যে চিন্তিত পক্ষান্তরে পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র একই ইউরোপ, একই ধর্মজাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়া স্বত্বেও চরম আর্থিক দুর্ভোগে পতিত। নরওয়ের আয়োতন ৩২৪০০০ বর্গ কি.মি. যা বাংলাদেশের দ্বিগুণেরও বেশি, জনসংখ্যা মাত্র ৪৫ লাখের মত, বলা যায় ঢাকা শহরে যে পরিমাণ

লোকের বসবাস পুরো নরওয়েতে তার চার ভাগের এক ভাগ লোক বাস করে। কী অন্যায়! যতদিন না মানবসৃষ্ট কৃত্রিম সীমান্তরেখা ভেদ করে মানবজাতি একজাতি না হবে, পৃথিবীর সকল স্থানের সমস্ত সম্পদ সমভাবে বন্টিত না হবে ততদিন এই অশান্তি দূর হবে না। এই বিশাল পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র জায়গায় মাত্র কয়েক লাখ বিলাসী মানুষকে অর্থের বন্যায় ভাসিয়ে দেওয়া আর সমস্ত মানবজাতিকে অন্যায়, অবিচার, রক্তপাত, ক্ষুধা, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেওয়ার মধ্যে আসমান জমিনের ফারাক। এই দ্বিতীয় অবস্থাটি সম্ভব করতে পারে কেবলমাত্র আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা। অথচ এই মোসলেম দাবিদার জনগোষ্ঠীটি আল্লাহর দেওয়া সেই জীবনব্যবস্থা ভুলে গিয়ে প্রভুদের চাপিয়ে দেওয়া জীবনব্যবস্থাগুলি যেমন গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি মেনে নিয়ে ভারবাহী পশুর মত প্রভুর আরাম আয়েশের যোগান দিয়ে যাচ্ছে, নিজেদের কষ্টার্জিত সম্পদ অঞ্জলিভরে প্রভুদের পায়ে সমর্পণ করছে।

যাহোক, এই বিপুল পরিমাণ সম্পদ কি ধনী ইউরোপীয়দেরকে সুখ দিতে পারছে? পারছে না। কারণ অর্থ মানুষকে আরাম দিতে পারে, কিন্তু সুখ-শান্তি প্রধানত একটি আত্মিক বিষয়। অর্থের প্রবেশাধিকার সেখানে নেই। তার প্রমাণ, আত্মহত্যার পরিসংখ্যানে বিশ্বের প্রথম তেরটি দেশের মধ্যে দশটি দেশই ইউরোপের। ১৩তম হোচ্ছে নরওয়ে। এই বছর নরওয়েতে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা চালিয়েছে পাঁচ হাজার তিনশ' জন। এর মধ্যে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা, উন্নত চিকিৎসার কারণে পাঁচশ ত্রিশ জন ব্যতিরেকে বাকী সবাইকে সুস্থ করতে সক্ষম হয় নরওয়ের হাসপাতালসমূহ। আত্মহননের অধিকার আদায়ে এসব দেশে আন্দোলন করে মানুষ। গত দশ বছরে প্রায় ৫০হাজার নরওয়েবাসী স্বেচ্ছামৃত্যু বরণের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু মৃত্যুর আগেই চিকিৎসা করে তাদেরকে ইহলোকেই বন্দী করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যার প্রবণতা সেখানে ৩৫-৪৪ বয়সসীমার মানুষের (World Health Organization)। অর্থাৎ জীবনের সবচেয়ে কর্মচঞ্চল সময়ে মানুষ জীবনের প্রতি মায়া হারাচ্ছে। সবচেয়ে বড় পরিহাস, এই নরওয়েই কি না মানুষকে শান্তির জন্য নোবেল দেয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এত অর্থ-বিত্ত-প্রতিপত্তি পেয়েও জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা কেন তাদের?

এর একটাই উত্তর, আসলে এই আত্মাহীন বস্তুবাদী সভ্যতা তাদের জীবনে শান্তি (Peace) দিতে পারছে না। কি করলে শান্তি পাবে খুঁজে না পেয়ে বিকৃতপথে পা বাড়াচ্ছে তাদের যুবসমাজ, তাদের

বিকৃত যৌনাচারের বিবরণ দেওয়া আমাদের পত্রিকার জন্য অমর্যাদাকর। কিছুদিন আগেই নরওয়ের অ্যান্ডারসন ব্রেইভিক একাই হত্যা করে ৭৭ জন নিরপরাধ নির্দোষ ব্যক্তিকে। সেই খুনী অ্যান্ডারসন ব্রেইভিকরা যাদের আদর্শের অনুসারী অর্থাৎ চরম ডানপন্থী বলে পরিচিত। তার ধর্ম এসলাম হলে তাদের দলকেও জঙ্গি দল বলা হত। সেই উগ্রবাদী কনজারভেটিভ দলই জাতীয় নির্বাচনে জয়ী হয়ে এখন সরকার গঠন করছে। এতেই বোঝা যায় নরওয়েবাসী কত অসুস্থ, কতটা বিকৃত তাদের রুচি ও জ্ঞানবোধ।

তবু তারা প্রাচ্যের দেশগুলোর সামনে নিজেদের অর্থগরিমা প্রকাশ করে আত্মতুষ্টি পেতে চায় আর প্রাচ্যের দাস মানসিকতার শাসক ও জনতাও তাদের দিকে হা করে চেয়ে থাকে। কী নির্লজ্জ হীনমন্যতা!

এ ঘটনাই এটা বোঝার জন্য যথেষ্ট যে, মানুষের সৃষ্টি করা বিধান দিয়ে জীবন পরিচালনা করার পরিণতি কত ভয়াবহ। বৈষম্য ছাড়িয়ে গেছে সকল বিশ্বরেকর্ড, মানবতা এখন কেবলই মুখের বুলি।

রসুলাল্লাহর (দ:) ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক

জান্নাতি ফেরকা কারা?

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

একদিন মহানবী (দ:) বোললেন, ইহুদি জাতি একাত্তর ভাগে বিভক্ত হোয়েছিল যার একটি ভাগ জান্নাতি আর সত্তরভাগ জাহান্নামী। খ্রিস্টান জাতি বাহাত্তর ভাগে বিভক্ত হোয়েছিল যার মধ্যে একাত্তর ভাগই জাহান্নামী একভাগ জান্নাতি। তাঁর শপথ যার হাতে মোহাম্মদের (দ:) প্রাণ, আমার উম্মাহ তেহাত্তর ভাগে বিভক্ত হবে যার মধ্যে একটি মাত্র ভাগ জান্নাতে যাবে, বাকি বাহাত্তর ভাগই জাহান্নামে যাবে।" রসুলাল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হোল, "তারা (জান্নাতি) কারা?" তিনি জবাব দিলেন,

“যারা আমাদের (অর্থাৎ আমি এবং আমার সাহাবীগণ) পথে আছে”। [আবু হোরায়রা (রা.) থেকে আবু দাউদ, আউফ বিন মালেক (রা:) থেকে ইবনে মাজাহ]

অতি সাংঘাতিক ও ভয়ঙ্কর কথা! ইহুদি ও খ্রিস্টানরা দীন নিয়ে মতভেদ কোরে যত ভাগে বিভক্ত হোয়েছিল আর উম্মতে মোহাম্মদী নামক এই জাতি আরও একধাপ বেশী হবে। এখানে ৭৩ ফেরকা বোলতে অগণিত, অসংখ্যও বোঝায়। রসুলাল্লাহ বহু হাদীসে সত্তর সংখ্যাটি ব্যবহার কোরেছেন। যেমন দাজ্জাল সংক্রান্ত একটি হাদীসে বোলেছেন, ‘আমার উম্মাহর ৭০ হাজার লোক দাজ্জালের অনুসরণ কোরবে’ [আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে- শারহে সুন্নাহ]।

আরবী ভাষায় সত্তর বোলতে সাতের পিঠে শূন্য দিলে যেমন ৭০ বোঝায় তেমনি এর আরও একটা ব্যবহার আছে। সেটা হোল কোন সংখ্যাকে বহু বা অসংখ্য বোঝাবার জন্যও ঐ সত্তর সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। এটা শুধু ঐ সত্তর সংখ্যা দিয়েই করা হয়, অন্য কোন সংখ্যা, যেমন পঞ্চাশ বা একশ’ দিয়ে করা হয় না। আরবীতে সাত হাজার বা সত্তর হাজার বা সত্তর ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যাই শুধু বোঝায় না, অসংখ্য, অগণিত সংখ্যা বুঝায়।

আজ দুনিয়াময় মোসলেম বোলে পরিচিত যে জাতিটি আছে তারা বহু ভাগে, ফেরকায় বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগ অর্থাৎ প্রত্যেক ফেরকা বা মাযহাব বিশ্বাস করে যে, তারাই শুধু প্রকৃত মোসলমান, তাদের মাজহাব বা ফেরকাই ঠিক বাকি সব ফেরকা পথভ্রষ্ট। বিষয়টি যেমন অন্যান্য ধর্মের মত, এক ধর্মের লোক মনে করে তার ধর্মই ঠিক, বাকী অন্যান্য ধর্মের সবাই নরকে যাবে। আসলে পৃথিবীতে এসলাম ধর্ম ছাড়াও অন্যান্য যে ধর্মগুলি রোয়েছে সেগুলির অধিকাংশই কোন না কোন নবীর (আ:) অনুসারী, তারা তাদের নবীর দেখানো পথ থেকে বিচ্যুত হোয়ে গেছে। মোসলেম নামধারী এই জাতিও তাদের নবীর দেখানো, রেখে যাওয়া পথ থেকে বিচ্যুত হোয়ে গেছে। যতখানি পথভ্রষ্টতা, বিকৃতি আসলে, পূর্বে আল্লাহ নতুন নবী পাঠিয়েছেন, এই জাতিতে ততখানি বিকৃতি বহু পূর্বেই এসে গেছে। এরপরও নতুন নবী আসেন নি, কারণ, নবুওয়ত শেষ হোয়ে গেছে এবং শেষ রসুলের (দ:) প্রতিষ্ঠিত পথে, প্রকৃত এসলামে আবার ফিরে যাওয়ার জন্য অবিকৃত কোর’আন ও রসুলের হাদীস আছে যা অন্যান্য ধর্মে নেই। শেষ এসলামের বিভক্তিগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ ভাগ হোচ্ছে সুন্নী মাযহাব, দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাগ হোচ্ছে শিয়া মাযহাব। এই শিয়া মাযহাবের পণ্ডিতরাও

কোর'আন-হাদীসের চুলচেরা বিশ্লেষণে সুন্নী পণ্ডিতদের চেয়ে পেছনে পড়ে নেই এবং তাদের পাণ্ডিত্যের ফলে শিয়া মাযহাবও অগণিত ফেরকায় বিভক্ত হোয়ে গেছে সুন্নীদের মত। ফলে প্রকৃত এসলামের উদ্দেশ্য থেকে শিয়া-সুন্নী উভয় মাযহাবই বহু দূরে। কে বেশী দূরে কে কম দূরে এ পরিমাপ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার সাধ্যও নয়, আমি শুধু এইটুকুই জানি যে মহানবীর (দ:) কথিত একটিমাত্র ফেরকা বাদে শিয়া-সুন্নীসহ আর সমস্ত ফেরকা, মাযহাব আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে, অর্থাৎ মহানবীর (দ:) এসলামে নেই। সেই একমাত্র ফেরকা কোন্ ফেরকা তা পেছনে দেখিয়ে এসেছি। সুন্নীরা যেমন বিশ্বনবীর (দ:) প্রকৃত সুন্নাত ত্যাগ কোরে আল্লাহ-রসুলের নিষিদ্ধ 'চুলচেরা বিশ্লেষণ' কোরে উম্মাহটাকে টুকরো টুকরো কোরে ভেঙ্গে দিলেন এবং হাত থেকে তলোয়ার ফেলে দিয়ে তসবিহ নিয়ে খানকায়, হুজরায় ঢুকে উম্মাহর বহির্মুখী (Extrovert) গতিকে অন্তর্মুখী কোরে একে স্থবির কোরে দিলেন (Introvert), তেমনি শিয়ারাও তাদের মাযহাবকে চুলচেরা বিশ্লেষণ কোরে বহু ভাগে ভাগ কোরে দিলেন এবং নবীর (দ:) প্রকৃত সুন্নাহ অর্থাৎ দীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বাদ দিয়ে বহু পূর্বের এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাকে নিয়ে মাতম করাটাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম-কর্ম হিসাবে গ্রহণ কোরলেন। তারা বুঝলেন না যে, মাতম করা কোন জীবন্ত জাতির মুখ্য কাজ হোতে পারে না, মৃত জাতির হোতে পারে। উম্মতে মোহাম্মদীর দাবিদার কিন্তু কার্যতঃ শেরক ও কুফরীর মধ্যে নিমজ্জিত এই জাতির এখন উপায় কি? এর একমাত্র আশা আজ তেহাত্তর ফেরকার সেই একমাত্র জান্নাতি ফেরকা। সেই জান্নাতি ফেরকাই পারে এসলামের সঠিক পথটির উপরে মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথ দেখাতে।

সেই জান্নাতি ফেরকার লোক কোথায় আছে?

মহানবী যেহেতু বোলেছেন কাজেই জান্নাতি ফেরকার লোক অতি অবশ্যই আছে। থাকতেই হবে। তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাদের খুঁজে পাওয়া কঠিন কারণ তারা একত্রে এক জায়গায় নেই। তারা ১৬০ কোটি পথভ্রষ্ট জনসংখ্যার মাঝে এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। আজ তাদের একত্রিত হোতে হবে। তাদের উপর বিরাট বিশাল দায়িত্ব।

১৬০ কোটির এই জনসংখ্যা আল্লাহ, রসুলের, কোর'আনের বিশ্বাসী হোয়েও আজ আকীদার ভুলে শেরক ও কুফরে ডুবে আছে। আল্লাহর নবীকে কেন পাঠিয়েছেন, নবীর কাজ কি ছিল, পবিত্র

কোর'আন কেন নাযেল কোরেছেন এই দীনের উদ্দেশ্য কি, প্রকৃত এবাদত কি ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক আকীদা না থাকার কারণে আজ তাদের মোকাম্মেল ঈমান থাকা সত্ত্বেও কাফের মোশরেক হোয়ে আছে। কারণ ঐ যে, ফকীহরা বোলেছেন আকীদা সহীহ না হোলে ঈমানের কোন দাম নেই। কাজেই আকীদা অর্থাৎ এই দীনের সামগ্রিক ধারণার বিকৃতির কারণে তাদের আজ কোন আমলই আল্লাহর দরবারে গৃহীত হোচ্ছে না। এখন আর আল্লাহর রহমত এই জাতির উপরে নেই। তার প্রমাণ হোল যে জাতিকে আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বোলেছেন (সুরা এমরান ১১০) সেই জাতি আজ পৃথিবীময় সর্ব নিকৃষ্ট। অন্য জাতির গোলাম।

আজ জান্নাতি ফেরকার প্রধান দায়িত্ব হোল পথভ্রষ্ট এই জাতিকে বিশ্বনবীর এসলামে, প্রকৃত এসলামে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা। এই কাজ খুবই কঠিন। এই কাজ কোরতে গিয়ে কঠিন বাধার সম্মুখীন হোতে হবে। প্রতিরোধ আসবে চারদিক থেকে। এ বিরোধিতা আসবে ইহুদি-খ্রিস্টান (Judio-Christian) 'সভ্যতার পদ্ধতিতে 'শিক্ষিত' বর্তমান নেতৃত্বের ও তাদের অনুসারীদের (Agent) কাছ থেকে। আল্লাহ রসুল ও এসলাম সম্পর্কে বিদ্বেষ তাদের আত্মার গভীরে প্রথিত, এসলামের কথা শুনলেই তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত জ্বলে যায়। বিরোধিতা আসবে বর্তমানের বিকৃত দীনের পুরোহিত, যাজকদের কাছ থেকে, ধর্ম যাদের রুজি-রোজগারের পথ, তাদের কাছ থেকে, ইউরোপিয়ান খ্রিস্টানরা মোসলেম জগৎ অধিকার কোরে মাদ্রাসা স্থাপন কোরে এসলাম শিক্ষার ছদ্মবেশে যে ধ্বংসকারী ফতোয়াবাজী শিক্ষা দিয়েছিলো সেই শিক্ষায় 'শিক্ষিত'দের কাছ থেকে, অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, রক্তপাত নির্মূল কোরে পৃথিবীতে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জন্য নবী করিম (দ:) তাঁর উম্মতের হাতে যে তলোয়ার ধোরিয়ে দিয়েছিলেন সেই তলোয়ার ফেলে দিয়ে তসবিহ হাতে নিয়ে যারা খানকায় ঢুকেছেন তাদের কাছ থেকে। প্রতিরোধ আসবে অন্যান্য বিকৃত ধর্মের অনুসারীদের কাছ থেকে। তারা মূলত ভুল বুঝেই বাধা দেবে। তারা মনে কোরবে এই সত্যদীন প্রতিষ্ঠিত হোলে তাদের ধর্মের উপরে আঘাত আসবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা আসবে না। আল্লাহর রসুলের প্রকৃত এসলামের সময় অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা সবচাইতে বেশী নিরাপদে ছিল। তাদের ধর্মীয় উপাসনালয়গুলিও নিরাপদ ছিল। তাদের জীবন সম্পদ নিরাপদ ছিল, বর্তমানের তথাকথিত গণতন্ত্রের অধীন, তাদের কারও ধর্মীয় উপাসনালয়ও

নিরাপদে নেই। তারা প্রায়ই আক্রান্ত হোচ্ছেন। যাই হোক তারা কিন্তু এই জান্নাতি ফেরকার লোকদেরকে বাধা দিবে না বুঝেই। অর্থাৎ বাধা আসবে সর্বদিক থেকে।

একদিন মহানবী (দ:) বোললেন, ইহুদি জাতি একাত্তর ভাগে বিভক্ত হোয়েছিল যার একটি ভাগ জান্নাতি আর সত্তরভাগ জাহান্নামী। খ্রিস্টান জাতি বাহাত্তর ভাগে বিভক্ত হোয়েছিল যার মধ্যে একাত্তর ভাগই জাহান্নামী একভাগ জান্নাতি। তাঁর শপথ যার হাতে মোহাম্মদদের (দ:) প্রাণ, আমার উম্মাহ তেহাত্তর ভাগে বিভক্ত হবে যার মধ্যে একটি মাত্র ভাগ জান্নাতে যাবে, বাকী বাহাত্তর ভাগই জাহান্নামে যাবে।" রসুলাল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হোল, "তারা (জান্নাতি) কারা?" তিনি জবাব দিলেন, "যারা আমাদের (অর্থাৎ আমি এবং আমার সাহাবীগণ) পথে আছে"। [আবু হোরায়রা (রা.) থেকে আবু দাউদ, আউফ বিন মালেক (রা:) থেকে ইবনে মাজাহ]

আজ দুনিয়াময় মোসলেম বোলে পরিচিত যে জাতিটি আছে তারা বহু ভাগে, ফেরকায় বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগ অর্থাৎ প্রত্যেক ফেরকা বা মাজহাব বিশ্বাস করে যে, তারাই শুধু প্রকৃত মোসলমান, তাদের মাজহাব বা ফেরকাই ঠিক বাকি সব ফেরকা পথভ্রষ্ট। এই বিভ্রান্তিকর পরিবেশ থেকে সত্যিকার জান্নাতি ফেরকাকে চিনে নেওয়ার উপায় কি? এ প্রশ্নেরই জবাব আমরা ধারাবাহিকভাবে দেওয়ার চেষ্টা কোরছি। এই ফেরকা মাজহাবের দেওয়াল কতখানি সাংঘাতিক এবং কঠিন যে, যুক্তি-তর্ক দিয়ে বুঝিয়ে একজন খ্রিস্টান বা হিন্দু বা বৌদ্ধকে ধর্মান্তরিত করা যতখানি প্রায় অসম্ভব বা কঠিন, একজন শিয়াকে সুন্নী বানানো বা একজন সুন্নীকে শিয়া বানানো, বা কাউকে এক ফেরকা থেকে অন্য ফেরকায় বদলানো ততখানি কঠিন, ততখানিই প্রায় অসম্ভব। তা হোলে এই জাতির এই উম্মাহর ঐক্যের উপায় কি? উপায় আছে। জান্নাতি ফেরকাকে মাঠে নামতে হবে। তারপর বাহাত্তর ফেরকাকে বোলতে হবে- ভাই! তোমাদের মধ্যে মসলা-মাসায়েল নিয়ে যত মতভেদই থাক, তোমরা তো অন্ততঃ এক আল্লাহয়, এক রসুলে আর এক কোর'আনে বিশ্বাস কর। মেহেরবানী কোরে শুধু এর উপর তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও। বাকি যত মতভেদ আছে সেগুলি তোমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ওমনি থাক, আপত্তি নেই, ওগুলি নিয়ে মতান্তর সৃষ্টি করো না। যেখানে আল্লাহর নবী (দ:) বহুবার বোলেছেন যে আল্লাহকে একমাত্র এলাহ (জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে) বোলে গ্রহণ কোরে নিলেই জাহান্নামের আগুন আর স্পর্শ কোরতে পারবে না, জান্নাতে প্রবেশ কোরবে, সেখানে অনাব্যশ্যক খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মতান্তর কোরে ধ্বংস হোয়ে যাওয়া

কতখানি বোকামী কতখানি নির্বুদ্ধিতা। যে জাতিকে আল্লাহ আদেশ কোরেছেন সমস্ত মতভেদ ত্যাগ কোরে সকলে ইস্পাতের মত কঠিন ঐক্যবদ্ধ হোয়ে আল্লাহর দেয়া রজ্জু অর্থাৎ তার দেয়া জীবন-বিধানকে আঁকড়ে ধোরে রাখতে, কোন বিচ্ছিন্নতাকে প্রশ্রয় না দিতে (সূরা আল-ইমরান ১০৩)। সে জাতি তুচ্ছ খুঁটিনাটি মসলা-মাসায়েলের তর্ক নিয়ে শতধা বিচ্ছিন্ন, আল্লাহর পরিষ্কার সরাসরি আদেশ লংঘনকারী। যে মসলা-মাসায়েল মাকড়শার জালে এই জাতি নিজেকে জড়িয়ে

রসুলাল্লাহর একজন নৈকট্যপ্রাপ্ত সাহাবী হুজর বিন আদী (রা:)। আলী (রা:) এর খেলাফতের সময়ে মাবিয়া (রা:) এর নেতৃত্বে যখন জাতির মধ্যে চরম বিভক্তি ও গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তখনও হুজর বিন আদী আলীর (রা:) থেকে তাঁর আনুগত্যের শপথ প্রত্যাহার কোরে নেন নি। এই কারণে মাবিয়া (রা:) হুজর বিন আদীকে (রা:) মৃত্যুদণ্ড দেন। তাঁর কবর হয় সিরিয়ার দামেস্কে। এই দুঃখজনক নাটকের শেষ অংক অনুষ্ঠিত হয় গত ২ মে ২০১৩ তারিখে। উপরের ছবিতে যে ধ্বংসস্তুপটি দেখা যাচ্ছে তা হুজর বিন আদীর (রা:) কবর। কোন বহিঃশত্রুর বোমার আঘাতে এই কবরটি ধ্বংস হয় নি, এটি ধ্বংস কোরেছে মোসলেম জনসংখ্যারই অন্তর্ভুক্ত একটি ফেরকা যাদের পরিচয় হোচ্ছে ওয়াহাবী। কবর ভাঙ্গার পর সেখানে হুজর বিন আদীর (রা:) অক্ষত দেহ মোবারক উদ্ধার করা হয় যা তাঁর শাহাদাত বরণের প্রমাণ বহন করে।

ফেলে স্থবির হোয়ে গেছে, অথর্ব হোয়ে গেছে, সেই মসলা-মাসায়েল থেকে নিজেদের মুক্ত কোরতে বললে এই হতভাগ্য জাতি তা শুনবে না, মানবে না, কারণ আজ মহা নবীর (দ:) প্রকৃত সুন্নাহ জেহাদের চেয়ে, পৃথিবীতে এই দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের চেয়ে, দাড়ি, মোচ কতখানি লম্বা হবে তা তাদের কাছে অনেক বেশী দরকারী, অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। কাজেই তাদের বোলতে হবে, যার যতটুকু খুশী দাড়ি, মোচ রাখো, যার যে পাশে ইচ্ছা শোও, যার যতটুকু ইচ্ছা টাখনুর উপর পাজামা

পর, কিন্তু ওগুলো নিয়ে কোন মতান্তর সৃষ্টি না কোরে শুধু আল্লাহর ওয়াহদানীয়াতে আর মোহাম্মদের (দ:) নবুয়তের উপর একত্র হও, অন্য কোন কথা উত্থাপন কোরো না। আল্লাহ ও রসুলের (দ:) উপর দৃঢ় বিশ্বাস ঈমান থাকা সত্ত্বেও আকীদার বিকৃতির ফলে কার্যতঃ শেরক ও কুফরের মধ্যে নিমজ্জিত জাতিকে মনে করিয়ে দিতে হবে দাড়ি, মোচ, পাজামা, নফল এবাদতের কথা বাদ দিন, একেবারে খোদ কোর'আনেরও কোন আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য নিয়ে কোন মতভেদ, মতান্তর কুফর। বোলেছেন স্বয়ং রসুলাল্লাহ (দ:) এবং বোলেছেন রাগান্বিত হোয়ে (হাদীস আব্দাল্লাহ বিন ওমর (রা:) থেকে-মোসলেম, মেশকাত)। রাগান্বিতের কারণ এই মতভেদই হোলো কোন জাতির অনৈক্য ও পরিণামে ধ্বংসের কারণ। শুধু জাতি কেন, যে কোন প্রতিষ্ঠান, সমিতি বা দলকে এমন কি একটা পরিবারকেও ধ্বংস কোরে দেবার জন্য মতভেদ অনৈক্য যথেষ্ট।

মহানবীর (দ:) সময়ে শিয়া ছিলো না, সুন্নী ছিলো না, কোন মাযহাব কোন ফেরকা ছিলো না এ কথা ইতিহাস। তার (দ:) সময়ে এসলামে যা ছিলো না তেমন কিছু যোগ করা হোচ্ছে বেদা'ত এবং বেদা'তের এই সংজ্ঞা সর্বসম্মত। তা হোলে সমস্ত মযহাব, সমস্ত ফেরকা বেদা'ত শেরকের সম পর্য্যায়ের গুনাহ, অমার্জনীয় অপরাধ, যে অপরাধ ক্ষমা না করার জন্য আল্লাহ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কাজেই জান্নাতি ফেরকার অন্যতম কর্তব্য হবে এই জাতিকে বলা যে আকীদার বিকৃতির ফলে তুমি তওহীদেই নেই। গায়রুল্লাহর আইন-কানুনের মধ্যে বাস কোরে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ না কোরে শেরকে নিমজ্জিত অবস্থায় আছ, তোমার আবার মযহাব কি? ফেরকা কি? একই সংজ্ঞায় প্রচলিত ভারসাম্যহীন বিকৃত সুফীবাদের তরিকাগুলিও বেদা'ত। কারণ, বিশ্বনবীর (দ:) সময় কোন তরিকা ছিলো না, এ কথা সর্বসম্মত ইতিহাস। তার সময়ে যেমন একটি মাত্র জাতি ছিলো, "উম্মতে মোহাম্মদী" তেমনি তরিকাও মাত্র একটিই ছিলো, "তরিকায়ে মোহাম্মদী"। ঐ তরিকা ছিলো বিপ্লবী, সংগ্রামী, জীবন উৎসর্গকারী, বহির্মূখী, বিস্ফোরণমুখী। আর এখন প্রচলিত বিভিন্ন তরিকাগুলি ঠিক বিপরীতমুখী, অন্তর্মুখী। তরিকায়ে মোহাম্মদীর হাতে ছিলো অস্ত্র, কর্মক্ষেত্র ছিলো উন্মুক্ত পৃথিবী। বর্তমানের তরিকাগুলির হাতে তসবিহ, কর্মক্ষেত্র খানকায়, হুজরায় চার দেয়ালের ভেতরে। তরিকায়ে মোহাম্মদী তাদের প্রাণ জেহাদে উৎসর্গ কোরে ঐ তরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার, সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান শাহাদাত ও আল্লাহর ভালবাসা লাভ করার জন্য দেশ ছেড়ে দেশান্তর বছরের পর বছর যুদ্ধ কোরে কাটিয়ে দিতেন। বর্তমানের তরিকা প্রাণ উৎসর্গ দূরে থাক,

সামান্যতম সংঘর্ষ, সামান্যতম বিপদের সম্ভাবনা যেখানে আছে, তা অতি সন্তর্পণে এড়িয়ে চলেন এক কথায় ঐ তরিকা আর এই তরিকা ঠিক বিপরীত মুখী। একটি পুর্বমূখী অন্যটা পশ্চিম মুখী; একটা উত্তর মুখী অন্যটা দক্ষিণ মুখী।

সুতরাং জান্নাতি ফেরকার কোন মানুষকে যদি বাহাত্তর ফেরকার কেউ প্রশ্ন করে আপনি শিয়া না সুন্নি, না আহলে সুন্নাত আল জামাত, না আহলে হাদীস, হানাফী না শাফেয়ী, না মালেকী, না হাম্বলী, না অন্য কিছু? তবে তার জবাব হবে- ভাই! আমি ওসবের কোনটাই নই। আমি তো শুধু প্রাণপণে চেষ্টা কোরছি মো'মেন ও উম্মতে মোহাম্মদী হোতে। একটা বিল্ডিং, ইমারতের মধ্যে প্রবেশ কোরলে তবে তো প্রশ্ন আসতে পারে আমি কোন কামরায় আছি? আমরা এসলামের ইমারতের মধ্যেই নেই, কোন কামরায় থাকি সে প্রশ্ন তো অবান্তর!

একদিন মহানবী (দ:) বোললেন, ইহুদি জাতি একাত্তর ভাগে বিভক্ত হোয়েছিল যার একটি ভাগ জান্নাতি আর সত্তরভাগ জাহান্নামী। খ্রিস্টান জাতি বাহাত্তর ভাগে বিভক্ত হোয়েছিল যার মধ্যে একাত্তর ভাগই জাহান্নামী একভাগ জান্নাতি। তাঁর শপথ যার হাতে মোহাম্মদদের (দ:) প্রাণ, আমার উম্মাহ তেহাত্তর ভাগে বিভক্ত হবে যার মধ্যে একটি মাত্র ভাগ জান্নাতে যাবে, বাকী বাহাত্তর ভাগই জাহান্নামে যাবে।" রসুলাল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হোল, "তারা (জান্নাতী) কারা?" তিনি জবাব দিলেন, "যারা আমাদের (অর্থাৎ আমি এবং আমার সাহাবীগণ) পথে আছে"। [আবু হোরায়রা (রা.) থেকে আবু দাউদ, আউফ বিন মালেক (রা:) থেকে ইবনে মাজাহ]

আজ দুনিয়াময় মোসলেম বোলে পরিচিত যে জাতিটি আছে তারা বহু ভাগে, ফেরকায় বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগ অর্থাৎ প্রত্যেক ফেরকা বা মাজহাব বিশ্বাস করে যে, তারাই শুধু প্রকৃত মোসলমান, তাদের মাজহাব বা ফেরকাই ঠিক বাকি সব ফেরকা পথভ্রষ্ট। এই বিভ্রান্তিকর পরিবেশ থেকে সত্যিকার জান্নাতি ফেরকাকে চিনে নেওয়ার উপায় কি? এ প্রশ্নেরই জবাব আমরা ধারাবাহিকভাবে দেওয়ার চেষ্টা কোরছি। জান্নাতী ফেরকার অন্যতম কর্তব্য হবে মোসলেম বোলে পরিচিত এই জনসংখ্যাকে প্রশ্ন করা যে, আল্লাহর রসুলের (দ:) সঙ্গে সর্বদা থেকে, তার সঙ্গে প্রতিটি সংগ্রামে সঙ্গী হোয়ে সরাসরি তার কাছে থেকে যারা এসলাম কি, তা শিখেছিলেন, তারাই ঠিক এসলাম শিখেছিলেন, না আজকের মওলানা, মওলবী, পীর-মাশায়েখরা যে এসলাম এই জাতিকে শেখান এই এসলাম ঠিক? এ ব্যাপারে দু'একটি হাদীস উল্লেখ করা অসঙ্গত হবে না। রসুলাল্লাহ (দ:)

বোলেছেন- আমার সঙ্গীরা উজ্জ্বল তারকার মত- তাদের যে কাউকে মানুষ অনুসরণ কোরতে পারে (হাদীস ওমর বিন খাত্তাব (রা:) থেকে রাযিন মেশকাত)। এর অর্থ হোচ্ছে মহানবী স্বয়ং তার সঙ্গীদের এসলাম কি, এর উদ্দেশ্য কি, ঐ উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়া কি সবই শিক্ষা দিয়েছেন সুতরাং প্রকৃত এসলাম কি তা ঐ আসহাবদের চেয়ে বেশী কেউ জানতে বুঝতে পারতে পারে না, তা অসম্ভব। কারণ তারা আল্লাহর রসুলের সঙ্গে সর্বদা থেকে, তার সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম কোরে তার প্রতি সুখ-দুঃখে অংশীদার হোয়ে যে প্রকৃত শিক্ষা তার কাছ থেকে লাভ কোরেছেন সে শিক্ষা পরবর্তীতে কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আর যে হাদীসে বিশ্বনবী (দ:) বোললেন, 'আমার উম্মাহ ভবিষ্যতে তেহাত্তর ভাগে (ফেরকায়) বিভক্ত হোয়ে যাবে। এবং ঐ তেহাত্তর ফেরকার মধ্যে একটি ফেরকা জান্নাতী (অর্থাৎ সঠিক এসলামে থাকবে) আর বাকী বাহাত্তর ফেরকাই আগুনে নিক্ষিপ্ত (না'রি) হবে। ঐ একমাত্র জান্নাতী ফেরকা কোনটা এই প্রশ্নের জবাবে আল্লাহর রসুল (দ:) বোললেন, যার উপর আমি ও আমার সাহাবীরা আছি (হাদীস- আবদুল্লাহ বিন আমর (রা:) থেকে- তিরমিযি, মেশকাত)। এ ব্যাপারে অগণিত হাদীস উল্লেখ করা যায় যাতে সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে না যে মহানবী (দ:) জানতেন যে তিনি তাঁর আসহাবদের প্রকৃত দীন শিক্ষা দিতে সক্ষম হোয়েছিলেন। এখন একটা অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন হোচ্ছে এই, যে কাজটা শেষ নবীর (দ:) উম্মাহ তার ওফাতের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ কোরে দিলো অর্থাৎ অস্ত্র হাতে স্বদেশ থেকে বের হোয়ে পড়লো এর অর্থ কি? আবার বোলছি এই জীবন ব্যবস্থায় অর্থাৎ এসলামের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির গুরুত্ব নির্দেশনায় এই ঘটনা একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। উম্মতে মোহাম্মদীর পতনের মূলে যে কয়েকটি প্রধান কারণ কাজ কোরেছে তার মধ্যে অন্যতম হোচ্ছে এই ঐতিহাসিক ঘটনার মূল্যায়নে পরবর্তী কালের উম্মাহর ব্যর্থতা। তদানিন্তন পৃথিবীর বোধহয় সবচেয়ে পশ্চাদপদ, সবচেয়ে অশিক্ষিত, সবচেয়ে দরিদ্র এই জাতিটি হঠাৎ কোরে মরুভূমির গভীর অভ্যন্তর থেকে একযোগে বেরিয়ে এসে শক্তিশালী সভ্যজগতের মুখোমুখী হোয়ে দাঁড়ালো। এ কথা বুঝতে কোন অসুবিধা নেই যে, ঐ উম্মাহ নিশ্চয়ই ঐ কাজটাকে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বোলেই বিবেচনা কোরেছিলেন। তা না হলে রসুলাল্লাহর (দ:) ওফাতের সঙ্গে সঙ্গে তারা একযোগে ঐ কাজ কোরতে সব কিছু ত্যাগ কোরে আরব থেকে বের হোয়ে পড়তেন না।

বিশ্বনবীর (দ:) সাহচর্যে থেকে তার কাছ থেকে সরাসরি যারা এই জীবন ব্যবস্থার মর্মবাণী, উদ্দেশ্য, প্রক্রিয়া শিক্ষা কোরেছিলেন তারা কি বোঝেন নি কোন কর্তব্য বড়, কোন কর্তব্য ছোট? কোনটা আগে কোনটা পরে (Priority)? মহানবীর (দ:) আসহাব যদি তা না বুঝে থাকেন তবে আমরা চৌদ্দশ' বছর পরে তা বোঝার কথা চিন্তাও কোরতে পারি না। তাহলে বিশ্বনবীর (দ:) উম্মাহর ঐ কাজের প্রকৃত অর্থ কি?

এই মহা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদীর আরব থেকে বের হোয়ে অন্যান্য জাতির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হোয়ে যাওয়ার প্রকৃত অর্থ এই যে, রসুলাল্লাহর (দ:) কাছ থেকে সরাসরি এসলাম শিক্ষা করার ফলে তারা সঠিকভাবে বুঝেছিলেন এসলাম কি, এর উদ্দেশ্য কি, ঐ উদ্দেশ্য অর্জন করার প্রক্রিয়া কি, কোনটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কোনটা কম প্রয়োজনীয়। তারা বুঝেছিলেন আল্লাহর প্রতি ইবলিসের চ্যালেঞ্জ হোচ্ছে সে মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে দীন অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে

এই গণকবরে শোয়ানো হবে ৪৫ জন শিয়া মুসলমানকে যারা ১৭/০২/১৩ তারিখে পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে সুন্নী মুসলমানদের হামলায় প্রাণ হারান। নিজেরা নিজেরা দাঙ্গা কোরে এমন হতাহতের ঘটনা মোসলেম বিশ্বের প্রাত্যহিক ঘটনা।

হয় বিকৃত না হয় অস্বীকার কোরিয়ে মানুষকে দিয়ে বিধান তৈরী কোরিয়ে মানুষকে অশান্তি, অবিচার, যুদ্ধ রক্তপাতের মধ্যে পতিত করাবে। আর সেই অন্যায়, অবিচার আর রক্তপাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ যে জীবন ব্যবস্থা তার নবীর (দ:) মাধ্যমে পাঠালেন সেটাকে সর্বাত্মক সংগ্রামের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা হোচ্ছে তাদের সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম কর্তব্য। ঐ শিক্ষাই তাদের নেতা, স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তাঁর শেষ ও বিশ্বনবী (দ:) তাদের দিয়ে গিয়েছিলেন, নিজে কোরে তাদের হাতে কলমে শিখিয়ে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ মানব জাতিকে অশান্তি, অবিচার, অন্যায়, রক্তপাত, যুদ্ধ থেকে বাঁচাবার জন্য পৃথিবীতে শান্তি, এসলাম, প্রতিষ্ঠার জন্য, যে জন্য বিশ্বনবীকে (দ:) আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, ঐ জাতি নিজেদের সব কিছু কোরবান কোরে সেই কাজ কোরতে আরব থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

আল্লাহর রসুলের (দ:) শেখানো এসলামের বিপরীতমুখী বর্তমানের বিকৃত এসলামের ধারক-বাহকরাও অস্বীকার করতে পারবে না যে এই দীনে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান রাখা আছে শহীদদের জন্য। আল্লাহর দেয়া সহজ-সরল পথ, সেরাতুল মোস্তাকীমকে, দীনুল কাইয়্যেমাকে যারা এক কঠিন দুর্বোধ্য দীনে পরিণত কোরে বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত কোরে এর শক্তি নিঃশেষ কোরে দিয়েছেন, আর যারা বিশ্বনবী (দ:) যে উম্মাহর হাতে তলোয়ার ধরিয়ে দিয়ে তাকে ঘর থেকে বের কোরে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই উম্মাহর হাত থেকে তলোয়ার ছিনিয়ে নিয়ে, তার হাতে তসবিহ ধরিয়ে দিয়ে তাকে পেছনে টেনে খানকায়, হুজরায় বসিয়ে দিয়ে তার গতি রুদ্ধ কোরে স্থবির, অনড় কোরে দিয়েছেন, তাদের কাজের সম্মিলিত ফল এই হোয়েছে যে এই উম্মাহর চরিত্রের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য, অপরাজেয়, দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা তা লুপ্ত হোয়ে সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হোয়েছে পলায়নপর কাপুরুষতা। প্রতিটি অন্যায়, প্রতিটি অবিচারের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধংদেহী মনোভাব এই উম্মাহর চরিত্রে মহানবী (দ:) সৃষ্টি কোরেছিলেন তা পর্যবসিত হোয়েছে সমস্ত অন্যায়, সমস্ত অবিচার থেকে অতি সযতেœ এড়িয়ে গা বাঁচিয়ে চলায়, অন্যায়কে গ্রহণ করায়, ঘৃণ্য কাপুরুষতায়। জান্নাতী ফেরকার প্রধান কর্তব্য হবে এই উম্মাহর হারিয়ে যাওয়া সেই সংগ্রামী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন চরিত্রকে আবার জাতির জীবনে ফিরিয়ে আনা।

রসুলাল্লাহ (দ:) বোলেছেন- বনি ইসরাইল বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হোয়ে গিয়েছিলো, আমার উম্মাহ তেয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে এবং মাত্র একটি ফেরকা (যেটা জান্নাতী) বাদে সবগুলি ফেরকাই আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। অতি স্বাভাবিক কথা। কারণ যে ঐক্য ছাড়া পৃথিবীতে কোন কাজই

করা সম্ভব নয়, কাজেই যে ঐক্যকে অটুট রাখার জন্য আল্লাহ সরাসরি হুকুম কোরলেন-"আমার দেওয়া দীন সকলে একত্রে ধোরে রাখো এবং নিজেরা বিচ্ছিন্ন হোয়ো না (সূরা এমরান ১০৩)" যে ঐক্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মহানবী (দ:) বোললেন, "কোর'আনের কোন আয়াতের অর্থ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক কুফর (হাদীস আব্দাল্লাহ বিন ওমর (রা:) থেকে-মুসলিম, মেশকাত)" যে ঐক্য ও শৃঙ্খলা সুদৃঢ় করার জন্য বোললেন-"কান কাটা নিগ্রো ক্রীতদাসও যদি তোমাদের নেতা হয় তাহোলেও ঐক্যবদ্ধভাবে তার আদেশ নির্দেশ পালন কর [এরবাদ বিন সারিয়াহ (রা:) থেকে আহমদ, আবু দাউদ তিরমিযি এবং ইবনে মাজাহ, মেশকাত] সেই ঐক্যকে যারা ভেঙ্গে তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হোয়ে যাবে- তারা আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে না তো কোথায় নিক্ষিপ্ত হবে? জান্নাতে?

তৃতীয় কথা হলো যে একটি মাত্র ফেরকা (ভাগ) জান্নাতী হবে- যেটার কথা রসুলাল্লাহ (দ:) বোলেছেন- সেটা সেই কাজ নিয়ে থাকবে যে কাজের উপর তিনি ও তাঁর আসহাব ছিলেন। তিনি (দ:) ও তাঁর আসহাব (রা:) কিসের উপর- কোন কাজের উপর ছিলেন? সেই মহাজীবনী যারা পড়েছেন, তাঁর (দ:) সাহাবাদের ইতিহাস যারা পড়েছেন-তাদের এ কথা স্বীকার করা ছাড়া কোন পথ নেই যে, নবুয়ত পাওয়ার সময় থেকে শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত এই অতুলনীয় মানুষটির একটিমাত্র কাজ ছিলো। সেটা হলো এই শেষ জীবনব্যবস্থা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা কোরে মানুষের জীবনে ন্যায়-শান্তি আনা এবং তার জীবিত অবস্থায় ও তাঁর ওফাতের পরে তাঁর সঙ্গীদেরও (আসহাব) জীবন ঐ একই কাজে ব্যয় হোয়েছে। অর্থাৎ নেতা ও তার জাতির সম্পূর্ণ জীবন কেটেছে মানব জাতির কল্যাণের জন্য। যে কল্যাণের একটিমাত্র পথ-মানবের জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহর দেওয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা, এক কথায় আল্লাহকে দেওয়া ইবলিসের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় আল্লাহকে জয়ী কোরে সমস্ত মানব জাতিকে অন্যায়-অবিচার-অশান্তি-যুদ্ধ ও রক্তপাত থেকে উদ্ধার কোরে পরিপূর্ণ শান্তি, এসলাম প্রতিষ্ঠা করা। যে বা যারা এই সংগ্রাম কোরবে শুধু তারাই রসুলাল্লাহর (দ:) সুন্নাহ পালনকারী, অর্থাৎ যার উপর আল্লাহর রসুল (দ:) ও তার আসহাব (রা:) ছিলেন। ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য কোরলে দেখা যাবে বিশ্বনবীর (দ:) ঐ সঙ্গীরা (আসহাব) তাঁর ওফাতের পর তাদের নেতার উপর আল্লাহর অর্পিত কাজ একাগ্রচিত্তে চালিয়ে গেলেন, পার্থিব সমস্ত কিছু উৎসর্গ কোরে চালিয়ে গেলেন। কারণ তাদের কাছে ঐ কাজ ছিলো বিশ্বনবীর (দ:) সুন্নাহ। ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য কোরলে আরও দেখা যায় যে, বিশ্বনবীর (দ:) সংসর্গ যারা লাভ কোরেছিলেন; সরাসরি তাঁর কাছ থেকে এই দীন শিক্ষা কোরেছিলেন; এই দীনের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়া শিক্ষা

কোরেছিলেন তারা তাঁর (দ:) ওফাতের পর ৬০/৭০ বছর পর্য্যন্ত বেঁচেছিলেন এবং ঐ ৬০/৭০ বছর পর বিশ্বনবীর (দ:) সাক্ষাত-সঙ্গীরা (রা:) শেষ হোয়ে যাবার পরই পৃথিবীতে এই দীন প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রাম বন্ধ হোয়ে গিয়েছিলো। এই সংগ্রাম যেই মুহূর্তে বন্ধ হলো জাতি হিসাবে ত্যাগ করা হলো সেই মুহূর্ত থেকে জাতি হিসাবে প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী শেষ হোয়ে গেলো। সেই জন্য মহানবী (দ:) তাঁর সুন্নাহ বোলতে শুধু তাঁর নিজের সুন্নাহ বোললেন না। বোললেন- "আমি ও আমার সঙ্গীরা যার উপর আছি" এবং অন্য সময় এও বোললেন যে "আমার উম্মাহর আয়ু ৬০/৭০ বছর।"

এই সংগ্রাম-জেহাদ ত্যাগ কোরে অর্থাৎ আল্লাহর রসুলের (দ:) প্রকৃত সুন্নাহ ত্যাগ কোরে এই জাতি যখন শান-শওকতের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য রাজতন্ত্রের মত রাজত্ব কোরতে শুরু করলো তখন এক সমস্যা দেখা দিলো। সেটা হলো এই জাতি তার নেতার সুন্নাহ পালন কোরবে কেমন কোরে? প্রকৃত সুন্নাত ত্যাগ করা হোয়েছে অথচ সুন্নাহ ছাড়া চোলবেও না। কারণ আল্লাহর রসুল বোলেছেন, "তার সুন্নাহ ত্যাগ করার অর্থই উম্মতে মোহাম্মদী থেকে বহিষ্কার হওয়া।" এই সমস্যা থেকে জাতিকে উদ্ধার কোরলেন সেই অতি বিশ্লেষণকারী পণ্ডিত শ্রেণী, ফকীহ-মুফাসসির ইত্যাদি। সেটা হলো আসল সুন্নাহ যখন বর্জনই করা হোয়েছে তখন নকলটাই করা যাক। তখন সুন্নাহ হিসাবে নেয়া আরম্ভ হলো বিশ্বনবীর (দ:) ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলি যে গুলির সাথে তাঁর জীবনের মুখ্য ও চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর খাওয়া-শোয়া-ওঠা-বসা ইত্যাদি নেহায়েত ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার। তাঁর (দ:) সুন্নাহ বোলতে তিনি কখনই এগুলি বোঝান নি, বোঝালেও ওগুলো পালন না করার জন্য তার উম্মাহ থেকে বহিষ্কার অবশ্যই বোঝান নি। কারণ যে কাজের জন্য তাঁকে পৃথিবীতে পাঠানো হোয়েছিলো অর্থাৎ 'সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া যে পর্য্যন্ত না সমস্ত পৃথিবীর মানুষ আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান মানিনা এবং মোহাম্মদ (দ:) আল্লাহর প্রেরিত, একথা বিশ্বাস না করে- সালাত কায়েম না করে, যাকাত না দেয় (আব্দাল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বোখারী)। ঐ কাজের সাথে ঐ সংগ্রামের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত অভ্যাস-পছন্দ-অপছন্দের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু ঐ সমাধানই গ্রহণ করা হলো এবং আজ পর্য্যন্ত এ হাস্যকর সমাধানই এই জাতি অতি নিষ্ঠার সাথে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পালন করার চেষ্টা কোরছে।

একদিন মহানবী (দ:) বোললেন, ইহুদি জাতি একাত্তর ভাগে বিভক্ত হোয়েছিল যার একটি ভাগ জান্নাতী আর সত্তরভাগ জাহান্নামী। খ্রিস্টান জাতি বাহাত্তর ভাগে বিভক্ত হোয়েছিল যার মধ্যে একাত্তর ভাগই জাহান্নামী একভাগ জান্নাতি। তাঁর শপথ যার হাতে মোহাম্মদদের (দ:) প্রাণ, আমার উম্মাহ তেহাত্তর ভাগে বিভক্ত হবে যার মধ্যে একটি মাত্র ভাগ জান্নাতে যাবে, বাকী বাহাত্তর ভাগই জাহান্নামে যাবে।" রসুলাল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হোল, "তারা (জান্নাতী) কারা?" তিনি জবাব দিলেন, "যারা আমাদের (অর্থাৎ আমি এবং আমার সাহাবীগণ) পথে আছে"। [আবু হোরায়রা (রা.) থেকে আবু দাউদ, আউফ বিন মালেক (রা:) থেকে ইবনে মাজাহ]

আজ দুনিয়াময় মোসলেম বোলে পরিচিত যে জাতিটি আছে তারা বহু ভাগে, ফেরকায় বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগ অর্থাৎ প্রত্যেক ফেরকা বা মাজহাব বিশ্বাস করে যে, তারাই শুধু প্রকৃত মোসলমান, তাদের মাজহাব বা ফেরকাই ঠিক বাকি সব ফেরকা পথভ্রষ্ট। এই বিভ্রান্তিকর পরিবেশ থেকে সত্যিকার জান্নাতি ফেরকাকে চিনে নেওয়ার উপায় কি? এ প্রশ্নেরই জবাব আমরা ধারাবাহিকভাবে দেওয়ার চেষ্টা কোরছি। যে একটি মাত্র ফেরকা (ভাগ) জান্নাতী হবে- যেটার কথা রসুলাল্লাহ (দ:) বোলেছেন- সেটা সেই কাজ নিয়ে থাকবে যে কাজের উপর তিনি ও তাঁর আসহাব ছিলেন। তিনি (দ:) ও তাঁর আসহাব (রা:) কিসের উপর- কোন কাজের উপর ছিলেন? সেই মহাজীবনী যারা পড়েছেন, তাঁর (দ:) সাহাবাদের ইতিহাস যারা পড়েছেন-তাদের এ কথা স্বীকার করা ছাড়া কোন পথ নেই যে, নবুয়ত পাওয়ার সময় থেকে শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত এই অতুলনীয় মানুষটির একটিমাত্র কাজ ছিলো। সেটা হলো এই শেষ জীবনব্যবস্থা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা কোরে মানুষের জীবনে ন্যায়-শান্তি আনা এবং তার জীবিত অবস্থায় ও তাঁর ওফাতের পরে তাঁর সঙ্গীদেরও (আসহাব) জীবন ঐ একই কাজে ব্যয় হোয়েছে। অর্থাৎ নেতা ও তার জাতির সম্পূর্ণ জীবন কেটেছে মানব জাতির কল্যানের জন্য। যে কল্যাণের একটিমাত্র পথ-মানবের জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহর দেওয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা, এক কথায় আল্লাহকে দেওয়া ইবলিসের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় আল্লাহকে জয়ী কোরে সমস্ত মানব জাতিকে অন্যায়-অবিচার-অশান্তি-যুদ্ধ ও রক্তপাত থেকে উদ্ধার কোরে পরিপূর্ণ শান্তি, এসলাম প্রতিষ্ঠা করা। যে বা যারা এই সংগ্রাম কোরবে শুধু তারাই রসুলাল্লাহর (দ:) সুন্নাহ পালনকারী, অর্থাৎ যার উপর আল্লাহর রসুল (দ:) ও তার আসহাব (রা:) ছিলেন। ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য কোরলে দেখা যাবে বিশ্বনবীর (দ:) ঐ সঙ্গীরা

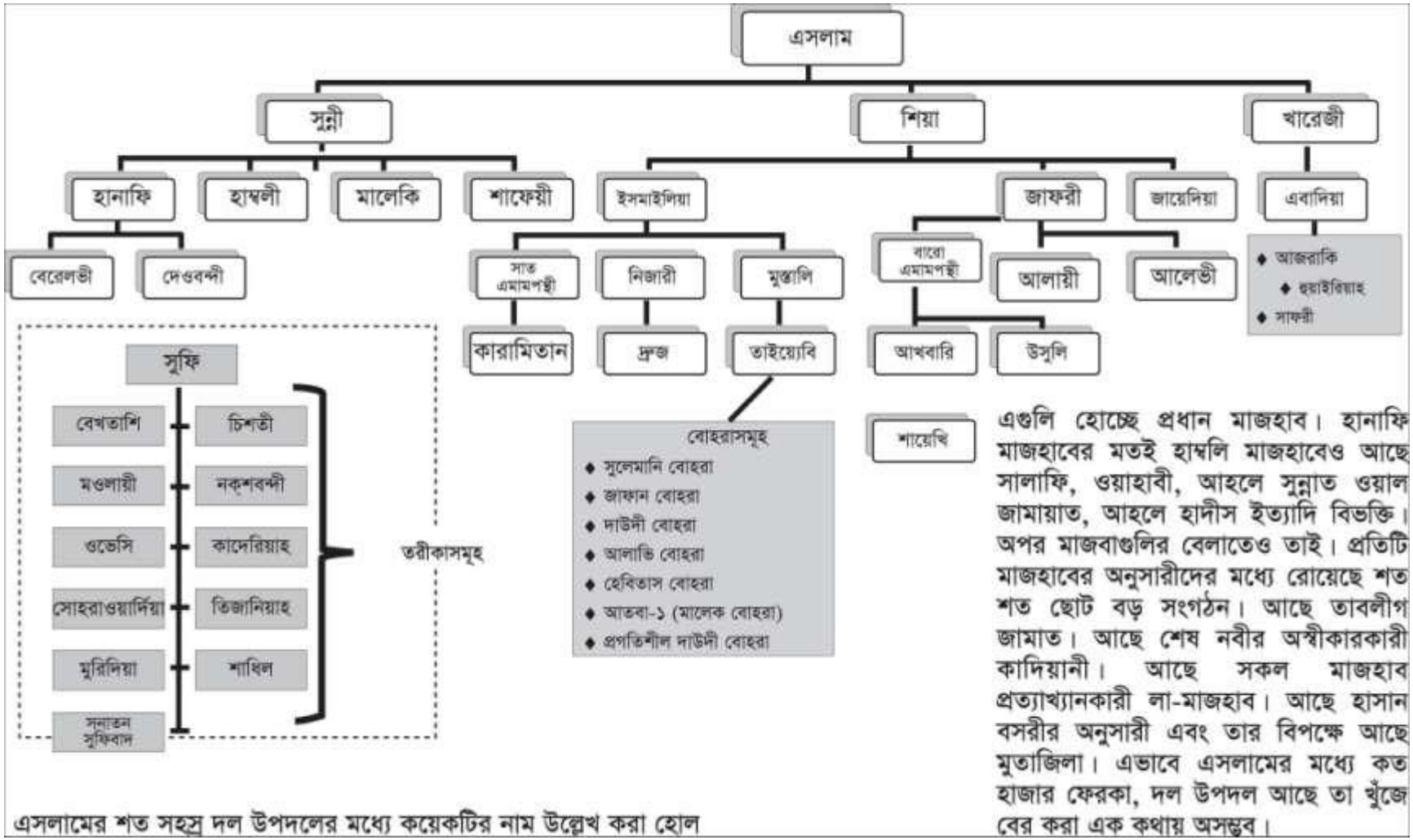

এসলামের শত সহস্র দল উপদলের মধ্যে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হোল

এগুলি হোচ্ছে প্রধান মাজহাব। হানাফি মাজহাবের মতই হাম্বলি মাজহাবেও আছে সালাফি, ওয়াহাবী, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, আহলে হাদীস ইত্যাদি বিভক্তি। অপর মাজবাগুলির বেলাতেও তাই। প্রতিটি মাজহাবের অনুসারীদের মধ্যে রোয়েছে শত শত ছোট বড় সংগঠন। আছে তাবলীগ জামাত। আছে শেষ নবীর অস্বীকারকারী কাদিয়ানী। আছে সকল মাজহাব প্রত্যাখ্যানকারী লা-মাজহাব। আছে হাসান বসরীর অনুসারী এবং তার বিপক্ষে আছে মুতাজিলা। এভাবে এসলামের মধ্যে কত হাজার ফেরকা, দল উপদল আছে তা খুঁজে বের করা এক কথায় অসম্ভব।

(আসহাব) তাঁর ওফাতের পর তাদের নেতার উপর আল্লাহর অর্পিত কাজ একাগ্রচিত্তে চালিয়ে গেলেন, পার্থিব সমস্ত কিছু উৎসর্গ কোরে চালিয়ে গেলেন। কারণ তাদের কাছে ঐ কাজ ছিলো বিশ্বনবীর (দ:) সুন্নাহ। ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য কোরলে আরও দেখা যায় যে, বিশ্বনবীর (দ:) সংসর্গ যারা লাভ কোরেছিলেন; সরাসরি তাঁর কাছ থেকে এই দীন শিক্ষা কোরেছিলেন; এই দীনের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়া শিক্ষা কোরেছিলেন তারা তাঁর (দ:) ওফাতের পর ৬০/৭০ বছর পর্য্যন্ত বেঁচেছিলেন এবং ঐ ৬০/৭০ বছর পর বিশ্বনবীর (দ:) সাক্ষাত-সঙ্গীরা (রা:) শেষ হোয়ে যাবার পরই পৃথিবীতে এই দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বন্ধ হোয়ে গিয়েছিলো। এই সংগ্রাম যেই মুহূর্তে বন্ধ হলো জাতি হিসাবে ত্যাগ করা হলো সেই মুহূর্ত থেকে জাতি হিসাবে প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী শেষ হোয়ে গেলো। সেই জন্য মহানবী (দ:) তাঁর সুন্নাহ বোলতে শুধু তাঁর নিজের সুন্নাহ বোললেন না। বোললেন- "আমি ও আমার সঙ্গীরা যার উপর আছি" এবং অন্য সময় এও বোললেন যে "আমার উম্মাহর আয়ু ৬০/৭০ বছর।"

এই সংগ্রাম-জেহাদ ত্যাগ কোরে অর্থাৎ আল্লাহর রসূলের (দ:) প্রকৃত সুন্নাহ ত্যাগ কোরে এই জাতি যখন শান-শওকতের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য রাজতন্ত্রের মত রাজত্ব কোরতে শুরু করলো তখন এক সমস্যা দেখা দিলো। সেটা হলো এই জাতি তার নেতার সুন্নাহ পালন কোরবে কেমন কোরে? প্রকৃত সুন্নাত ত্যাগ করা হোয়েছে অথচ সুন্নাহ ছাড়া চোলবেও না। কারণ আল্লাহর রসুল বোলেছেন, "তার সুন্নাহ ত্যাগ করার অর্থই উম্মতে মোহাম্মদী থেকে বহিষ্কার হওয়া।" এই সমস্যা থেকে জাতিকে উদ্ধার কোরলেন সেই অতি বিশ্লেষণকারী পণ্ডিত শ্রেণী, ফকীহ- মুফাসসির ইত্যাদি। সেটা হলো আসল সুন্নাহ যখন বর্জনই করা হোয়েছে তখন নকলটাই করা যাক। তখন সুন্নাহ হিসাবে নেয়া আরম্ভ হলো বিশ্বনবীর (দ:) ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলি যে গুলির সাথে তাঁর জীবনের মুখ্য ও চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর খাওয়া-শোয়া-ওঠা-বসা ইত্যাদি নেহায়েত ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার। তাঁর (দ:) সুন্নাহ বোলতে তিনি কখনই এগুলি বোঝান নি, বোঝালেও ওগুলো পালন না করার জন্য তার উম্মাহ থেকে বহিষ্কার অবশ্যই বোঝান নি। কারণ যে কাজের জন্য তাঁকে পৃথিবীতে পাঠানো হোয়েছিলো অর্থাৎ 'সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া যে পর্য্যন্ত না সমস্ত পৃথিবীর মানুষ আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান মানিনা এবং মোহাম্মদ (দ:) আল্লাহর প্রেরিত, একথা বিশ্বাস না করে- সালাত কায়েম না করে, যাকাত না দেয় [হাদীস-

আব্দাল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বোখারী]। ঐ কাজের সাথে ঐ সংগ্রামের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত অভ্যাস-পছন্দ-অপছন্দের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু ঐ সমাধানই গ্রহণ করা হলো এবং আজ পর্য্যন্ত এ হাস্যকর সমাধানই এই জাতি অতি নিষ্ঠার সাথে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পালন করার চেষ্টা কোরছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের ধার্মিকরা যেমন প্রত্যেকে ভাবেন 'একমাত্র আমার ধর্মই ঠিক বাকিরা সব বিপথগামী নরকে যাবে' ঠিক তেমনি ভাবে তিয়াত্তর ফেরকার মধ্যে বাহাত্তর ফেরকার প্রত্যেকটি মানুষ অতি নিশ্চিত যে শুধু ঐ ফেরকাই রসুলাল্লাহর (দ:) প্রকৃত সুন্নাহ পালনকারী সুতরাং সে-ই নির্দিষ্ট জান্নাতী ফেরকা। তারাই যে নবীর (দ:) সুন্নাহ পালনকারী তাতে মানুষের যাতে কোন সন্দেহ না থাকে এজন্য অনেক ফেরকা তাদের ফেরকার নামেই সুন্নাহ শব্দটা যোগ কোরে রেখেছেন; অর্থাৎ একমাত্র আমরাই সুন্নাহ পালনকারী জান্নাতী ফেরকা। তারা একথা বুঝতে অসমর্থ যে বিশ্বনবী (দ:) তাঁর সুন্নাহ বোলতে যা বুঝিয়েছিলেন তার ধারে কাছেও তারা নেই। আসল জান্নাতী ফেরকার সুন্নাহর সাথে বাকি বাহাত্তর ফেরকার সুন্নাহর আসমান-যমিন তফাৎ। বর্তমানের বাহাত্তর ফেরকার কাছে সুন্নাহ হলো দাঁত মেসওয়াক করা; জান্নাতী ফেরকার কাছে সুন্নাহ ছিল রসুলাল্লাহ (দ:) ও আবু ওবায়দার (রা:) মত জেহাদে সশস্ত্র সংগ্রামে দাঁত ভেঙ্গে ফেলা। বাহাত্তর ফেরকার কাছে সুন্নাহ হলো নিজেদের ঘরে বা হুজরায় মাথার কাছে তসবিহ রেখে ডান পাশে শোয়া; জান্নাতী ফেরকার কাছে ছিল মাথার কাছে অস্ত্র রেখে যুদ্ধক্ষেত্রে শোয়া। বাহাত্তর ফেরকার কাছে সুন্নাহ হলো টুপি-পাগড়ী পড়া; জান্নাতী ফেরকার কাছে সুন্নাহ ছিল শিরস্ত্রাণ পড়া। আজকের বাহাত্তর ফেরকার কাছে সুন্নাহ হলো লম্বা জোব্বা পড়া; জান্নাতী ফেরকার কাছে সুন্নাহ ছিল যোদ্ধার কাপড় ও বর্ম পরা। বাহাত্তর ফেরকার কাছে সুন্নাহ হলো খাবার পর মিঠাই খাওয়া; জান্নাতী ফেরকার কাছে সুন্নাহ ছিল অনাহারে থেকে পেটে পাথর বেঁধে যুদ্ধ করা। আরও বহু আছে, দরকার নেই। বাহাত্তর ফেরকার সুন্নাহ পালন কোরতে রসুলাল্লাহ (দ:) ও তাঁর সাহাবাদের (রা:) মত কোরবানির প্রয়োজন হয় না, আহত হোতে হয় না, নিগৃহীত-অপমানিত হোতে হয় না, বিপদের সম্মুখীন হোতে হয় না। কাজেই তারা অতি নিষ্ঠার সাথে ঐ অতি নিরাপদ সুন্নাহগুলি পালন করেন এবং নবীর (দ:) ও আল্লাহর সন্তুষ্টি আশা করেন। শুধু আশা করেন না, ও সম্বন্ধে তারা অতি নিশ্চিত। যদিও তারা জান্নাতের সুগন্ধ পর্য্যন্ত পাবেন না, কারণ- বিশ্বনবী (দ:) বোলেছেন তারা না'রী, আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। বাহাত্তর ফেরকা যে সুন্নাহগুলি পালন করেন সেগুলি

শুধু বিশ্বনবীর (দ:) সুন্নাহ নয় সেগুলি লক্ষ কোটি খ্রিস্টান-ইহুদি, হিন্দু, বৌদ্ধের সুন্নাহও'! পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষই দাঁতন (মেসওয়াক) করে, কোটি কোটি অ-মোসলেম মাথায় টুপি দেয়, পাগড়ী পরে, দাড়ী রাখে, মোচ কামিয়ে ফেলে, খাবার পর মিঠাই খায়, ডানপাশে শোয়। এগুলি বাহাত্তর ফেরকার অতি প্রিয় সুন্নাহ। কিন্তু জান্নাতী ফেরকা যে সুন্নাহ পালন করে সে সুন্নাহ একমাত্র বিশ্বনবী (দ:) ও তাঁর আসহাব ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ পালন করেন না। সেটা হলো শেষ জীবন-ব্যবস্থা, দীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অপরিসীম দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম। বিশ্বনবীর (দ:) পবিত্র দেহে ছিলো যুদ্ধে যখম হওয়ার চিহ্ন, তাঁর আসহাবদের মধ্যে বোধ হয় একটা লোকও খুঁজে পাওয়া যেতোনা যার গায়ে অস্ত্রের আঘাত ছিলো না, বহু সাহাবী ছিলেন যাদের সমস্ত শরীর অস্ত্রের আঘাতের চিহ্নে ভরপুর ছিলো। ঐ সুন্নাহ হলো সেই একমাত্র জান্নাতী ফেরকার সুন্নাহ। বাকি বাহাত্তর ফেরকার সুন্নতীদের সারা গায়ে সুঁচের দাগও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা 'দীনুল কাইয়্যেমা'কে সমস্ত পৃথিবীতে কার্যকরী কোরে মানব জাতির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম (জেহাদ) ও করার যে সুন্নাহ বিশ্বনবী (দ:) ও তাঁর সঙ্গীরা (রা:) রেখে গেছেন সেই সুন্নাহকে বুঝিয়েছিলেন যখন তিনি বোলেছিলেন যার উপর আমি ও আমার সঙ্গীরা আছি এবং এও বোলেছেন যে, যারা এই সুন্নাহ ছেড়ে দেবে তারা আমাদের কেউ নয় অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদী নয়। মহানবীর (দ:) আসহাব যে নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছিলেন কোনটা তাঁর প্রকৃত সুন্নাহ, তার অকাট্য প্রমাণ হোচ্ছে সেই উম্মতে মোহাম্মদীর ইতিহাস; এখন যিনি আল্লাহর রসুলের (দ:) রেসালতের পর এই জাতির হাল ধোরেছিলেন সেই আবু বকরের (রা:) একটা কথা উল্লেখ কোরছি। জাতির খলিফা নির্বাচিত হোয়ে তার প্রথম বক্তৃতাতেই তিনি বোললেন, "মোসলেমরা! তোমাদের মধ্যে কেউ যেন জেহাদ পরিত্যাগ না করে। কোন জাতি একবার জেহাদ ত্যাগ কোরলে আল্লাহ সে জাতিকে অপদস্থ-অপমানিত না কোরে ছাড়েন না"। বিশ্বনবীর (দ:) ঘনিষ্টতম সঙ্গী (সাহাবা) তার সর্ব রকম বিপদ-আপদে সুখ-দুঃখের চিরসঙ্গী- নবীর (দ:) জীবিতকালেই যাকে উম্মতে মোহাম্মদীর নামাযে এমামতি করার হুকুম দেওয়া হোয়েছিলো- সেই আবু বকর (রা:) কি মহানবীর (দ:) কাছে থেকে এসলাম-এসলামের মর্মবাণী-প্রকৃত সুন্নাহ-এসব কি শিক্ষা করেন নি? নিশ্চয়ই কোরেছিলেন এবং শুধু আবু বকর (রা:) নন, বিশ্বনবীর (দ:) প্রত্যেক সাক্ষাত-সঙ্গীরা (রা:) কোরেছিলেন। আবু বকরের (রা:) মত তারাও জানতেন তাদের নেতার প্রকৃত সুন্নাহ কোনটা, তাই তাদের শেষ মানুষটা বেঁচে থাকা পর্য্যন্ত ঐ জেহাদ চালিয়ে গেছেন। আবু বকরের

(রা:) ঐ সাবধান বাণী কতখানি সত্য ছিলো তা ইতিহাস। যতদিন এই জাতি একাগ্র লক্ষ্যে (হানিফ) ঐ সুন্নাহ অর্থাৎ জেহাদ চালিয়ে গেলো ততদিন আল্লাহ স্বয়ং তাদের অভিভাবক হোয়ে তাদের সঙ্গে রোইলেন। তা না থাকলে তাদের ঐ অবিশ্বাস্য বিজয় অসম্ভব ছিলো। তারপর ৬০/৭০ বছর পর যখন এই জাতি ঐ জেহাদ বন্ধ করলো, তখন সংখ্যায় তারা প্রাথমিক অবস্থার চেয়ে প্রায় এক হাজার গুণ বেশী, পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক তাদের দখলে। হোলে কি হবে? জেহাদ ছাড়ার অর্থ বিশ্ব নবীর (দ:) সুন্নাহ ছাড়া, অর্থাৎ উম্মতে মোহম্মদী হোতে বহিষ্কার। কারণ তিনি তো বোলেই দিয়েছেন, যে আমার সুন্নাহ ছাড়লো সে আমাদের কেউ নয়। আবু বকর (রা:) বোলেছিলেন 'জেহাদ ছাড়লে আল্লাহ অপদস্থ অপমানিত কোরবেন'। দেখা গেলো আবু বকর (রা:) অনেক কম বোলেছিলেন। কারণ আল্লাহ শুধু অপদস্থ-অপমানিতই কোরলেন না, তিনি শত্রুদের দিয়ে নবীর (দ:) ব্যক্তিগত অভ্যাসের সুন্নাহ পালনকারী এবং উম্মতে মোহাম্মদীর দাবীদার এই বিরাট জাতিটাকে লাইন কোরে দাঁড় করিয়ে মেশিন গান কোরে, ট্যাংকের তলায় পিষে, জীবন্ত কবর দিয়ে, ফাঁসি দিয়ে, বেয়নেট করে, আগুনে পুড়িয়ে, তাদের মেয়েদের আফ্রিকা আর ইউরোপের বেশ্যালয়ে বিক্রি কোরিয়ে এবং তারপরে তাদের ঘৃণিত ক্রীতদাসে পরিণত কোরে দিলেন। এই সময়ের ইতিহাস পড়লে মনে হয় আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীর (দ:) প্রকৃত সুন্নাহ ত্যাগ করার, দীনের অতি বিশ্লেষণ কোরে জাতিকে টুকরো টুকরো কোরে দেওয়ার, এক বহির্মূখী গতিকে উল্টিয়ে অন্তর্মূখী কোরে দিয়ে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে শেষ কোরে দেওয়ার শাস্তি দিতে তার গযবের দরজা খুলে দিয়েছিলেন। সে শাস্তির ইতিহাস পড়লে গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যায়। ভুললে চোলবে না যে যখন এই লোমহর্ষক শাস্তি আল্লাহ এই জাতিকে দিয়েছিলেন তখন এই জাতির আইন-কানুন-বিচার-দণ্ডবিধি ইত্যাদি সবই কোর'আন-হাদীস মোতাবেক অর্থাৎ জাতি তখনও উম্মতে মোহাম্মদী না হোলেও মোসলেম। কিন্তু আল্লাহ তাও পরোয়া কোরলেন না। আর আজতো তাও নেই, ওগুলোও তো গায়রুল্লাহর মানুষের তৈরী, যেগুলো ধ্বংস কোরে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য উম্মতে মোহাম্মদীকে সৃষ্টি করা হোয়েছিলো। এই জাতি সেই কুফর ও শেরককে গ্রহণ কোরেও, সেই মোতাবেক জাতীয় জীবন চালিত কোরেও নবীর (দ:) কতকগুলি নেহায়েত ব্যক্তিগত অভ্যাস যেগুলি পালন করা নিরাপদ সেগুলি অতি নিষ্ঠার সাথে নকল কোরে নিজেকে অতি উৎকৃষ্ট উম্মতে মোহাম্মদী ভাবছে। কী পরিহাস, কী হাস্যকর!

আমার কথা

সম্মানিত পাঠক, আমি লেখক নই, লেখালেখির অভ্যাসও আমার নেই, তবু লিখতে হোল আত্মিক দায়বদ্ধতা থেকে। আমি গোমরাহ ছিলাম, সত্য কি জানতাম না। ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বুঝতাম না, হেদায়াহ কি জানতাম না। অন্ধকার ও জাহেলিয়াতের মধ্যে ছিলাম। যামানার এমাম, এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর মাধ্যমে সত্য পেয়েছি, হেদায়াহ পেয়েছি। মহান আল্লাহর অশেষ করুণায় দীর্ঘ এক যুগ তাঁর পদতলে স্থান পেয়েছি, তাঁর পবিত্র সান্নিধ্য লাভ করার তওফিক আল্লাহ দিয়েছেন। এটাই ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময়। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে আসা জ্ঞান মানবজাতির সামনে একটু একটু কোরে প্রকাশ কোরেছেন। অনেকের মত আমিও তাঁর সাথে থাকলেও এটা আমার পরম সৌভাগ্য যে তাঁর সত্যদীনের জ্ঞান প্রকাশ করার বেশির ভাগ সময়ই আমি তাঁর সংস্পর্শে ছিলাম। তিনি তাঁর সমস্ত জ্ঞানই আমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা কোরেছেন। আমরা যে যতটুকু পেরেছি সেগুলোকে আত্মস্থ কোরতে চেষ্টা কোরেছি এবং সেই সত্যদীনের আলো অন্ধকারাচ্ছন্ন দুনিয়ায় প্রকাশ করার চেষ্টা কোরে যাচ্ছি।

আমার এ বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় দাজ্জালের তৈরি শাসন পদ্ধতি "Divide and Rule"। আমরা দাজ্জালকে চিনতাম না, আমরাও বাকি মানবজাতির মত অন্ধ ছিলাম। মাননীয় এমামুয্যামান আমাদের জ্ঞানের চোখ খুলে দিলেন। আমরা চিনতে পারলাম যে, ইহুদি খ্রিস্টান ‘সভ্যতা’-ই হোচ্ছে রসুলাল্লাহ বর্ণিত সেই এক চক্ষুবিশিষ্ট দানব দাজ্জাল, যে অপশক্তি আজ মানুষের প্রভুর আসন দখল কোরে আছে। সেই সাথে আমরা এও জানতে পারলাম যে এই ‘চাকচিক্যময় প্রতারক’ কিভাবে পৃথিবীকে পরিচালনা কোরছে, পৃথিবীজুড়ে অশান্তির রাজত্ব কায়েম কোরে রেখেছে। পৃথিবী সমস্ত অশান্তির মূলে এই দাজ্জাল। সে মানবজাতিকে ভৌগোলিক, ভাষাভিত্তিক, সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ ভিত্তিক, সামাজিক, প্রশাসনিক, সামরিক-বেসামরিক ইত্যাদি সর্ব উপায়ে অসংখ্য ভাগে বিভক্ত কোরে রেখেছে। সে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু কোরে জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমনি কোরে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। অথচ প্রাকৃতিক নিয়ম

হোল, মানবজাতি যত ঐক্যবদ্ধ থাকবে তত তারা শান্তিতে থাকবে, সমৃদ্ধশালী হবে। আর যতই বিভক্ত হবে ততই তারা অশান্তির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হবে।

আমার লেখার মূল বিষয়বস্তুটি এমামুয্যামানের কাছ থেকে একটু একটু কোরে পাওয়া। বিভিন্ন সময়ে পাওয়া সেই জ্ঞানগুলিকে একত্র কোরে আমি আমার ভাষায় একটি রূপ দেওয়ার চেষ্টা কোরেছি মাত্র। শুধুমাত্র এজন্য লেখক হিসাবে তাঁর নাম উল্লেখ কোরতে পারলাম না, যেহেতু বইয়ের বাক্যগুলি হুবহু তাঁর লিখা নয়। আমার এই বইটির অধিকাংশই আমার ভাষ্য থেকে প্রিয় ভাই মো: রিয়াদুল হাসানের সম্পাদিত। আল্লাহ তাকে এর পূর্ণ প্রতিদান দিন এই দোয়া কোরি। আমরা কেউ লেখক নই, আমাদের পৃথক কোন সত্বা নেই, আমাদের মৌলিক পরিচয়ই হলো আমরা এমামুয্যামানের আত্মার সন্তান। তাঁর কথাই আমাদের কথা, তাঁর শিক্ষা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের একমাত্র কাজ। আমাদের এ কাঁচা লেখার ভুল-ভ্রান্তির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই এবং পাঠকদের কাছে দায় স্বীকার কোরি।

মানবজাতিকে রাজনৈতিকভাবে, রাষ্ট্রগতভাবে, শরিয়াহগতভাবে এবং এমনকি আত্মিকভাবে বিভক্ত কোরে শাসন ও শোষণ করার জন্য ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা'র রূপকাররা এক বিশ্বব্যবস্থার মতবাদের আড়ালে যে কয়টি হিংসাত্মক নীতি পৃথিবীতে কায়েম কোরেছে তার অন্যতম হোল Divide and Rule অর্থাৎ ঐক্যহীন করা - অতঃপর শাসন করা। সে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার কোরেছে, নিজেকে মানবজাতির রব, এলাহ, সমস্ত দুনিয়ার অধিকর্তা দাবী কোরছে। দাজ্জালের তৈরী জীবন-ব্যবস্থা, আইনকানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, শিক্ষানীতি, সংস্কৃতি সমস্ত কিছু আজ দুনিয়াময় কার্যকরী কোরেছে।

বিশ্বময় Divide and Rule নীতির বাস্তবায়নের জন্য চামড়ার রং, ভাষা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করা জাতি ও রাষ্ট্রগুলি প্রত্যেকটি নিজেদের ছাড়া বাকী মানব গোষ্ঠী থেকে আলাদা, স্বতন্ত্রভাবে দেখে; তাদের প্রত্যেকেরই মনোভাব হোচ্ছে যে কোনো উপায়েই হোক নিজের স্বার্থ রক্ষা কোরতেই হবে, এতে পার্শ্ববর্তী দেশের কত মানুষ হত্যা কোরতে হবে, কত মানুষ না খেয়ে মরবে, কত বাড়ী-ঘর, জনপথ ধ্বংস করা হবে তার কোনো হিসাব করার প্রয়োজন নাই। নিজ দেশের সীমান্তে নদীর গতিপথে বাঁধ দিয়ে অন্যদেশকে মরুভূমিতে পরিণত কোরে দেওয়া ন্যায়সঙ্গত কোরে নিয়েছে। এই সীমানা অতিক্রমের চেষ্টা কোরলে সীমান্তরক্ষীদের গুলি তাদেরকে ঝাঁঝরা কোরে দেয়। যতদিন এই বিভক্তিকরণ নীতি পৃথিবীতে চালু থাকবে, ততদিন মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে অশান্তি, যুদ্ধ রক্তপাত কেউ বন্ধ কোরতে পারবে না। তাহোলে কি এর কোন সমাধান নেই?

হ্যাঁ, অবশ্যই সমাধান আছে। আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি-যোগাযোগ-বিবেক-কৃষ্টি ইত্যাদি এক কথায় বিবর্তনের এমন একটা বিন্দুতে পৌছলো যখন সমগ্র মানব জাতি একটি মাত্র জীবন-বিধান গ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত হোয়েছে। তখনই আল্লাহ পাঠালেন শেষ নবী মোহাম্মদকে (দ:)। আল্লাহ চাইলেন বিভক্ত বিচ্ছিন্ন মানব জাতি নিজেদের ভেদাভেদ ভুলে আবার একটি মাত্র জাতিতে পরিণত হোক। তিনি জানিয়ে দিলেন, সমস্ত মানবজাতি একই বাবা-মায়ের সন্তান। তাদের কেউ কারো চেয়ে বড় নয়, ছোট নয়, সব সমান। ছোট-বড়র একটি মাত্র মাপকাঠি, সেটি হোল ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি (কোর'আন- সূরা আল-হুজরাত ১৩)। সেখানে চামড়ার রংয়ের, ভাষার, কোনো দেশে কার জন্ম বা বাস এসবের কোনো স্থান নেই। পৃথিবীর এই মাটি থেকে আদমকে সৃষ্টি করা হোয়েছে, তাই সৃষ্টিগতভাবেই এই পৃথিবীর উপর প্রতিটি মানুষের হক রোয়েছে। মানুষ ইচ্ছা কোরলে এই পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যেতে পারে, যে কোনো জায়গায় বসবাস করতে পারে, কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না। মানবজাতির মধ্যে বিরাজিত সকল প্রকার বিভক্তি মিটিয়ে দিয়ে সমগ্র বনী আদমকে একটা জাতিতে পরিণত করার জন্যই মহান আল্লাহ আখেরী নবীকে পাঠিয়েছিলেন। আজ আবার মহানবীর একজন প্রকৃত উম্মত হিসাবে এ যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর অনুসারী হেযবুত তওহীদ মানবজাতিকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হোয়েছেন।

প্রকাশনায়
তওহীদ প্রকাশন
৩১-৩২ পি.কে.রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল# ০১৭১১০০৫০২৫, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫
ওয়েবসাইট: www.hezbuttawheed.com
http://ataglance.hezbuttawheed.com